সাহিত্য মালঞ্চ-৩

উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

একাদশ শ্রেণি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

প্রকাশনা : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ, ত্রিপুরা

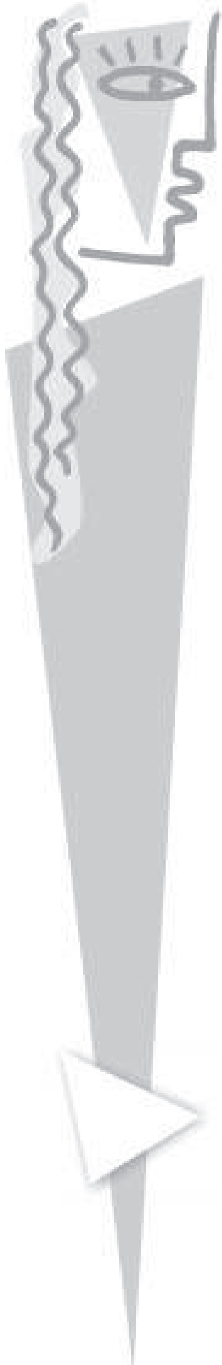

সাহিত্য মালঞ্চ-৩

মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

একাদশ শ্রেণি

গ্রন্থস্বত্ব : ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১৪
প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ : মে, ২০১৫
দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭
পুণর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রকাশক : অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (এস সি ই আর টি), ত্রিপুরা

সংকলন ও সম্পাদনা :
শ্রী শংকর বসু
ড. গীতা দেবনাথ
ড. স্মৃতি চক্রবর্তী
ড. নারায়ণ ভট্টাচার্য
ড. শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়
ড. স্বপন কুমার পোদ্দার
শ্রী নারায়ণ চন্দ্র শর্মা
শ্রী অনাদি চৌধুরী

প্রচ্ছদ ছবি : শ্রী কমল মিত্র

মূল্য : ১৮.০০ টাকা

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

মুখবন্ধ

সময়ের বিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো ক্রমবিকাশমান শিক্ষাক্রমও পরিবর্তনশীল। শিক্ষাকাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গো সাযুজ্য রেখে একাদশ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যসূচির সুসমঞ্জস নির্বাচন ও পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। জাতীয় স্তরের সঙ্গো সংগতি রেখে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্বকীয়তা বজায় রেখে একাদশ শ্রেণির 'সাহিত্য মালঞ্চ' প্রকাশ করল।

ভাষা-সাহিত্যও একই অবস্থানে, একই ভাবনায় অনড় থাকে না। ভাষার বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীর উপযোগী; মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে সহায়ক হৃদয়গ্রাহী রচনাবলির পারস্পরিক সমন্বয় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে পাঠ্যসূচির মধ্যে। প্রথম একক : কবিতা, দ্বিতীয় একক : গদ্য, তৃতীয় একক : ছোটোগল্প, চতুর্থ একক : নাটক, পঞ্চম একক : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ষষ্ঠ একক : ভাষা, সপ্তম একক : নির্মিতি, অষ্টম একক : প্রকল্প— এভাবে এককগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। 'ভাষা'-র ক্ষেত্রে নির্বাচিত 'অলংকার' পাঠক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের নম্বর বিভাজনের ক্ষেত্রেও এবার বড়ো পরিবর্তন হয়েছে। জাতীয় স্তরের সঙ্গো সংগতি রেখে নম্বর বিভাজিত হয়েছে যা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান ব্যবস্থায় লিখিত পরীক্ষা হবে আশি নম্বরের; বাকি কুড়ি নম্বর আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে বিদ্যার্থীদের নিজস্ব ভাবনার অবকাশ রয়েছে, এতে শিক্ষার্থীর সৃজন-ক্ষমতা, নান্দনিক-দক্ষতা ও চিন্তনের বিকাশ ঘটবে। সর্বোপরি সাহিত্যের চিরায়ত মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ- কৌতূহলের উদ্রেক হয় এবং আকর্ষণীয় হয়— এমন রচনা পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পঠনের ক্ষেত্র প্রসারিত করার লক্ষ্যে পাঠ্যতালিকার বাইরেও কিছু বাড়তি রচনা এই সংকলনে সংযোজিত হয়েছে। পূর্বতন লেখকদের বানানরীতিকে সম্মান- শ্রদ্ধা জানিয়েও বাংলা বানানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সমতা বিধানের প্রয়োজনে এই পাঠ্যপুস্তকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানরীতিকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিশ্বদরবারে নন্দিত ও বন্দিত। কবিতা, গদ্য, ছোটোগল্প ও নাটক সংকলনের ক্ষেত্রে কোন্ লেখকের কোন্ রচনাটি একাদশ শ্রেণির উপযোগী হবে তা নির্ণয় করা খুব সহজ কাজ নয়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সময়ের রচনা সংকলনের মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন, রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য অতিস্বল্প পরিসরে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে যাতে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুচারুরূপে সমাধা করে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর পক্ষে আমি সংকলকদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেইসঙ্গে ত্রিপুরার রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের অধিকর্তাকে এই বইটির মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

ঐকান্তিক প্রচেস্টা সত্ত্বেও একাদশ শ্রেণির 'সাহিত্য মালঞ্চ' সংকলনটি সমৃদ্ধ হয়েছে এমন দাবি করার অবকাশ নেই। প্রকাশিত পাঠ্যবইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগীদের মতামত ও সুচিন্তিত পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সর্বশেষে, ছাত্রছাত্রীদের কাছে বইটি গ্রহণযোগ্য হলেই আমাদের এই প্রয়াস সর্বতোভাবে সার্থক হবে বলে মনে করি।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

সভাপতি
ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

“**আমরা, ভারতের জনগণ**, ভারতকে **সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে **সামাজিক, অর্থনৈতিক** ও **রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম** এবং **উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন** ও **সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা** এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির **মর্যাদা** এবং **জাতীয় ঐক্য** ও **সংহতি** সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে **ভ্রাতৃত্বের** ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথগ্রহণ করে, আমাদের **গণপরিষদে** আজ, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান **গ্রহণ, বিধিবদ্ধ** এবং **নিজেদের অর্পণ** করছি।”

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ১৪-৩০, ৩২ ও ২২৬)

১. সাম্যের অধিকার

- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
- সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
- অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

২. স্বাধীনতার অধিকার

- বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
- শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
- সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
- ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
- ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
- জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

- কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খটানো যাবে না।
- চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

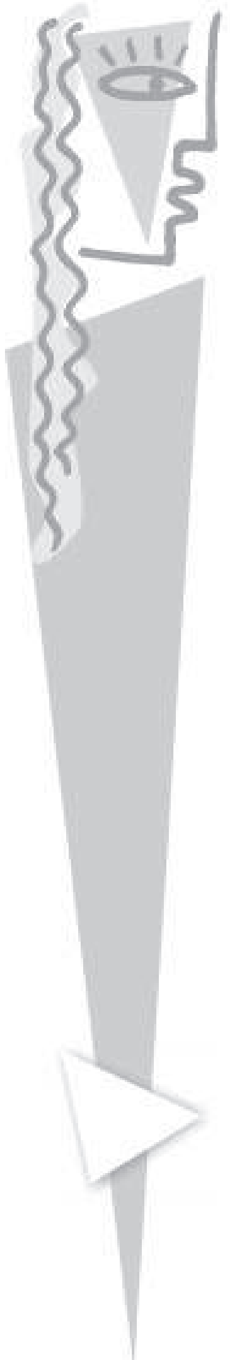

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

- সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান নিরাপত্তা কাউকে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না। এবং প্রত্যেকেই ধর্মাচরণের পূর্ণ এবং সমান অধিকার পাবে।
- রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাতি বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না।
- ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার

- ভারতের যে-কোনো নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে।
- ধর্ম, জাতি বা ভাষার দরুন কাউকে সরকারি অথবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার

- মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে— প্রয়োজনে বিশেষ লেখ (Write) জারি করতে পারবে : হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus), ম্যান্ডামাস (Mandamus), সারশিয়োরেরাই (Certiorari), প্রহিবিশন (Prohibition) ও কুয়ো ওয়ারান্টো (Quo-Warranto)।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ৫১এ)

১. সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ।
২. মহৎ যেসব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ।
৩. ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।
৪. আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।
৫. ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্‌বোধন।
৬. দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ।
৭. অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ।
৮. বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের বিকাশ।
৯. সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা।
১০. জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছোতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের এই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা।
১১. পিতা-মাতা/অভিভাবকের দায়িত্ব ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

সূচিপত্র

কবিতা

কাআ তরুবর	লুইপাদ	৯
গৌরচন্দ্রিকা	গোবিন্দদাস	১১
ফুল্লরার বারমাস্যা★	কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	১২
বঙ্গভাষা★	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৫
প্রার্থনা★	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬
জন্মভূমি	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৭
মধ্যাহ্ন★	অনঙ্গমোহিনী দেবী	১৮
আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাশ	২০
সাম্যবাদী	কাজী নজরুল ইসলাম	২১
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে★	শঙ্খ ঘোষ	২৩

গদ্য

বসন্তের কোকিল★	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৫
স্বাদেশিকতা★	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম★	স্বামী বিবেকানন্দ	৩৫
ভারতবর্ষ★	এস. ওয়াজেদ আলি	৪০
সরস্বতী কুণ্ডী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩
নেতাজি	সৈয়দ মুজতবা আলি	৪৯

ছোটোগল্প

ডাইনি★	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩
ঘূর্ণমান পৃথিবী★	আশাপূর্ণা দেবী	৭১
হেডমাস্টার	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৭৮

নাটক

মুকুট★	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০১

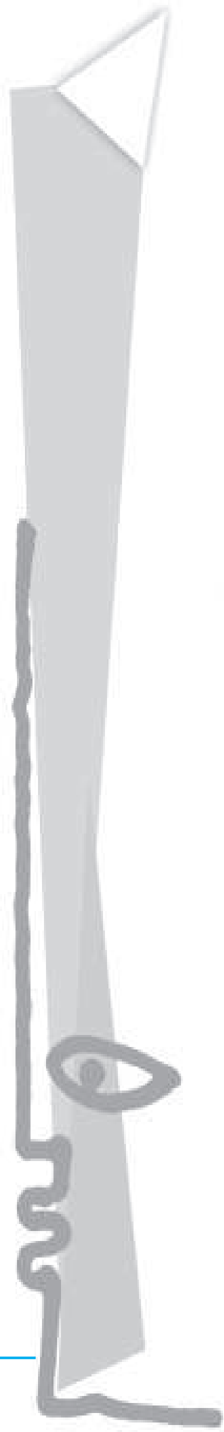

★চিহ্নিতকরণগুলি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত

কাআ তরুবর

লুইপাদ

(রাগ পটমঞ্জরি)

কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ।।
দিঢ়[১] করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।
সকল সমাহিঅ[২] কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই।।
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিড়ি[৩] লাহু রে পাস।
ভণই লুই আম্‌হে সানে[৪] দিঠা।
ধমণ[৫] চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা[৬]।।

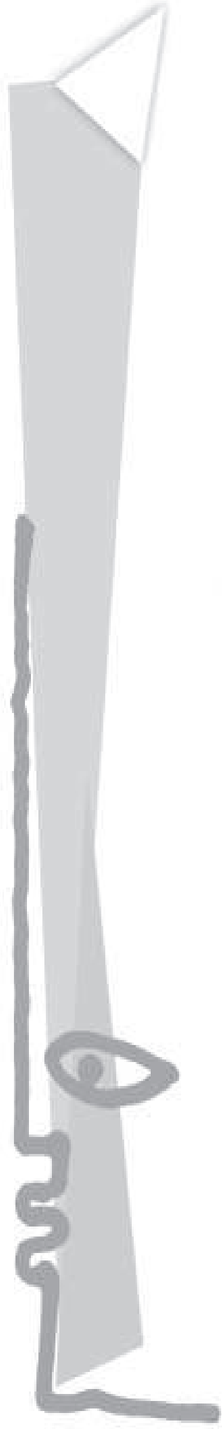

পাঠান্তর ঃ
১. দিট। ২. সহিঅ। ৩. ভিতি। ৪. ঝানে। ৫. ধবন। ৬. বইণ।।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :
কায়া তরুর মতো; পাঁচটি তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল (মৃত্যু) প্রবেশ করেছে। (চিত্ত) দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ করো। লুই বলেছেন, (কীভাবে তা করতে হবে) তা গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। সমস্ত সমাধিতে কী করে; সুখ-

দুঃখে সে নিশ্চিত করে (অর্থাৎ সমাধিতে সাময়িভাবে দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু সমাধি ভাঙলেই আবার সেই পূর্বাবস্থা) এড়িয়ে যাও ছন্দের (বাসনার) বন্ধন ও করণের (ইন্দ্রিয়ের) পারিপাট্যের আশা (অর্থাৎ, বাসনার বন্ধন এবং ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির আশা পরিত্যাগ করো), শূন্যপাখা পাশে চেপে ধরো (শূন্যতত্ত্ব বিচারের দিকে অগ্রসর হও)। লুই বলেছেন, আমি সংজ্ঞায় (ধ্যানে) দেখেছি। ধমণ (পূরক) চমণ (রেচক) দুই পিঁড়িতে (আমি) উপবিষ্ট।

গৌরচন্দ্রিকা

গোবিন্দদাস

নীরদ নয়নে   নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ   বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম   কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ-   কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ   সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশ রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম-   রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পুর।
তাকর চরণে   দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

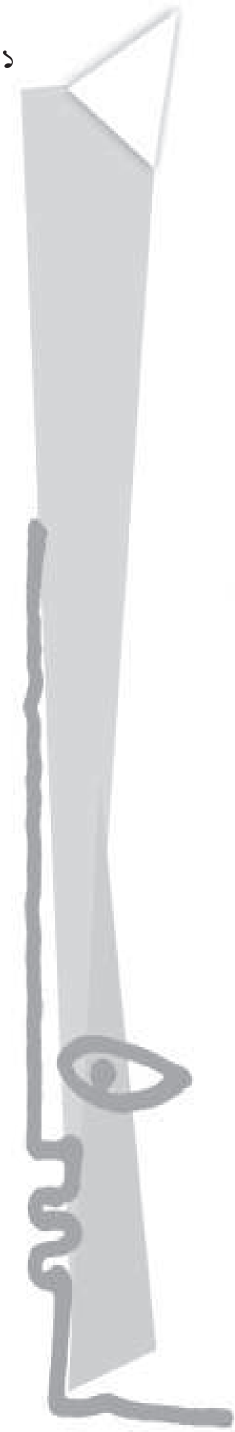

ফুল্লরার বারমাস্যা

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

বৈশাখ হৈল আগো মোরে বড়ো বিষ।
মাংস নাহি খায় সর্ব লোক নিরামিষ।।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
খরতর পোড়ে অঙ্গ রবির কিরণ।।
পসরা এড়িয়া জল খাত্যে যাত্যে নারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা সারি।।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বেঙচের ফল খায়্যা করি উপবাস।।
আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘে জল।
বড়ো বড়ো গৃহস্থের টুটয়ে সম্বল।।
মাংসের পসরা লয়্যা বুলি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ-কুড়া মিলে উদর না পুরে।।
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।
কাহারে বলিব কি দূষিব বাপ মায়।।
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।।

আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে পড়ে মাংস জল।
কত মাছি খায় অঙ্গে করমের ফল।।
অভাগ্য মনে গুনি অভাগ্য মনে গুনি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী।।

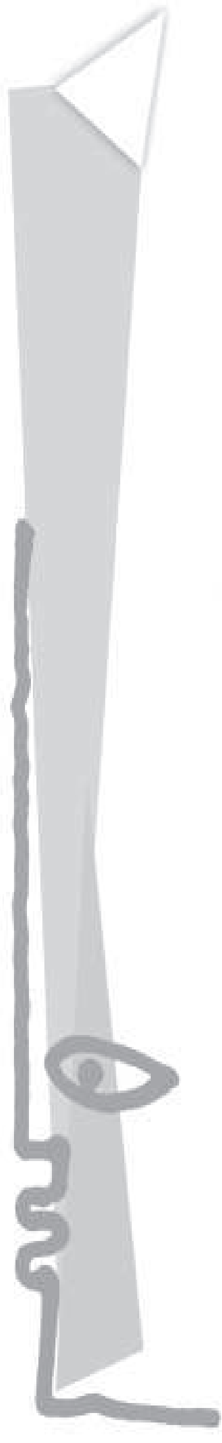

ভাদ্রপদ মাসে বড় দূরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আটদিকে জল।।

কিরাত পাড়াতে বসি না মেলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার।।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
লঘুবৃষ্টি কুড়াতে সদাই বহে বান।।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জনে জনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে।
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে।।
কার্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।।
নিয়োজিত কৈল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।।
মাস মধ্যে মাইশর আপনি ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।।

উদর ভরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তথি নিরমিল বিধি।।
বড়ো দুঃখ মনে গুনি বড়ো দুঃখ মনে গুনি।
পুরাণ খোসলা গায় দিতে করে পানি।।
কত নিবেদিব দুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ।
বিপাক পাইল স্বামী বিধাতা বৈমুখ।।
পৌষে সকল ভোগ সুখী সর্বজন।
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ।।
তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।।

হরণী বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা।।
বৃথা বনিতা-জনম বৃথা বনিতা-জনম।
ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।।
মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্‌ঝটি।
আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আক্ষটি।
ফুল্লরার কত আছে কর্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।

শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী।
কোন্ সুখে মোর সাথে হইবে ব্যাধিনী।।
সহজে শীতল ঋতু ফাগুন যে মাসে।
পোড়ায়ে রমণীগণ বসন্ত-বাতাসে।।
মধুমাসে মলয়-মারুত বহে মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।।
বনিতা-পুরুষ যত পীড়য়ে মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গা পুড়ে উদর-দহনে।।
দারুণ দৈব-দোষে গো দারুণ দৈব-দোষে।
একত্র শয়নে স্বামী যেন যোলো ক্রোশে।।
অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।
চালুসেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা।।
ফুল্লরার কত আছে করমের ফল।
মাটিয়া পাথরা বিনে অন্য নাহি স্থল।।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।

ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্বতী।
আশ্বাস করিয়া তারে বলেন ভারতী।।
আজি হইতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ।।

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, অবোধ আমি ! অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু, বহুদিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মন—
মজিনু-বিফল তবে অবরেণ্যে বরি,
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী, কয়ে দিলা পরে
"ওরে বাছা, মাতৃকোশে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।।

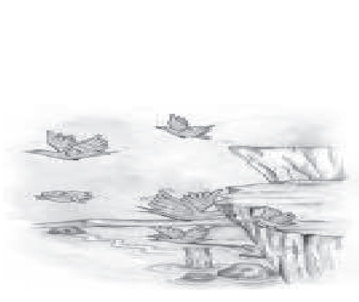

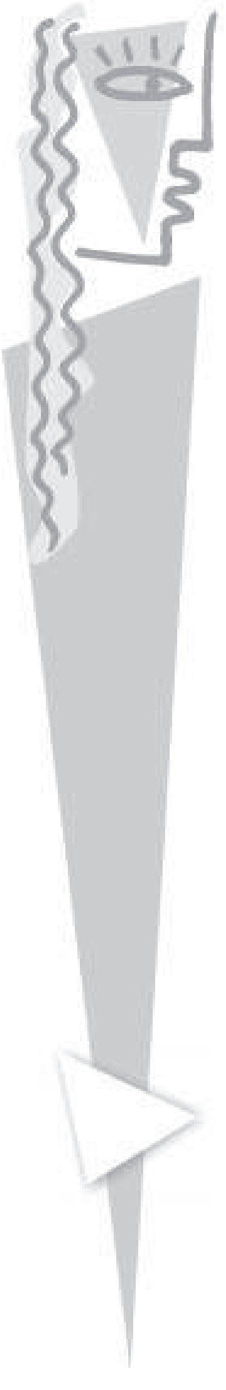

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।।

জন্মভূমি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধনধান্য-পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে-দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে!
ও তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে— উঠি পাখির ডাকে জেগে।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে;
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!
—ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি!

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে— আমার জন্মভূমি।।

মধ্যাহ্ন

অনঙ্গমোহিনী দেবী

প্রখর রবির তাপ বেলা দ্বিপ্রহর,
উষ্ণ বায়ু বহিতেছে করি সর সর;
শরতের সুনীলিম আকাশের গায়,
শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি ভেসে ভেসে যায়;
সুদূর আকাশ কোলে পাখা প্রসারিয়া,
উড়ে উড়ে যায় চিল ডাকিয়া ডাকিয়া;
অশ্বত্থ তরুর মূলে শীতল ছায়ায়,
ঘুমায়ে পড়েছে পান্থ, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়,
পীতবর্ণ শস্যক্ষেত্র শস্য ভারে নত,
প্রভাকর তপ্তকর বরষণে রত;
শরতের ভরা নদী স্রোত খরতর,
তীরে শোভে কৃষকের ছোটো ছোটো ঘর;
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র আঙ্গিনায়,
নাচিয়ে খঞ্জন দ্রুত চারিদিকে চায়।
বকুলের ঘন পত্র ছায়ায় বসিয়া,
দোয়েল দিতেছে শিস রহিয়া রহিয়া;
নানাবিধ বনলতা তাপে শুষ্ক কায়,
মাঝে মাঝে পড়িয়াছে সুশীতল ছায়;
বসিয়ে নদীর তীরে মাছরাঙ্গা পাখি,

যেন গনিতেছে ঢেউ অনিমেশ আঁখি;
ঘাটে বাঁধা ক্ষুদ্র তরি ভাসে দুলি দুলি,
উপরে বসিয়া কাক ডাকে নিরিবিলি।
অদূরে রাখাল ছেলে নিয়ে গাভিদলে,
জল পান করাইছে নামাইয়া জলে;
তাপে তপ্ত বাঁকা পথ ঝরিতেছে ধু ধু
কলশি লইয়ে কাঁখে চলিয়াছে বধূ।
ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনী খরবেগবতী
পতি সম্ভাষণে দ্রুত চলিছে গোমতী,
পর পাড়ে বনশ্রেণি সুনিবিড়তর,
কোথা হতে ডাকে ঘুঘু সকরুণ স্বর।
ধু ধু করে দীপ্ত মাঠ দিগ্ দিগন্তরে
তপ্ত বায়ু বয়ে যায় দূর বনান্তরে,
স্তব্ধ নীরব দিক, প্রচণ্ড তপন,
রহি রহি তপ্ত শ্বাস ফেলে সমীরণ,
প্রখর মধ্যাহ্ন বেলা দীপ্ত চারিদিক
নিঝুম প্রকৃতি সতী স্তব্ধ অনিমিখ!

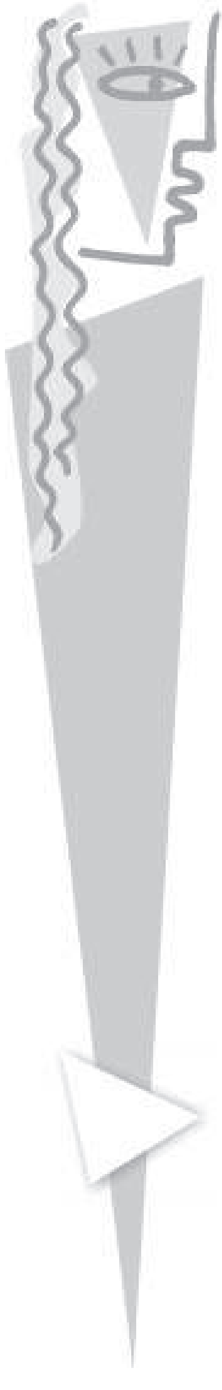

আবার আসিব ফিরে

জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব— কিশোরীর— ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে-ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;
হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়; —রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

সাম্যবাদী

কাজী নজরুল ইসলাম

গাহি সামের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম-ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি? পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভিল গারো?
কনফুসিয়াস্? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বল আরো!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যত শখ,—
কিন্তু, কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কশাকশি?— পথে ফুটে তাজা ফুল।
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা ঠাকুর মৃত পুথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।
বন্ধু, বিলিনি ঝুট,

এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ইশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়!
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হল মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই!

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

শঙ্খ ঘোষ

একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্য গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

একটা দুটো সহজ কথা
বলব ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।

কে কাকে ঠিক কেমন দেখে
বুঝতে পারা শক্ত খুবই
হা রে আমার বাড়িয়ে বলা
হা রে আমার জন্মভূমি!

বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য হল
যা-কিছু আজ ব্যক্তিগত।

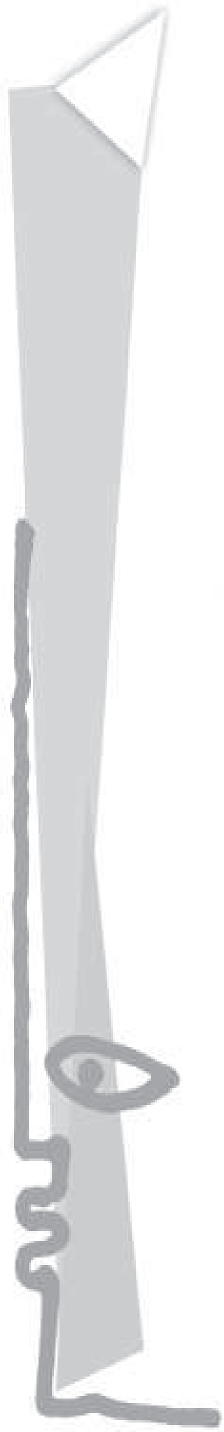

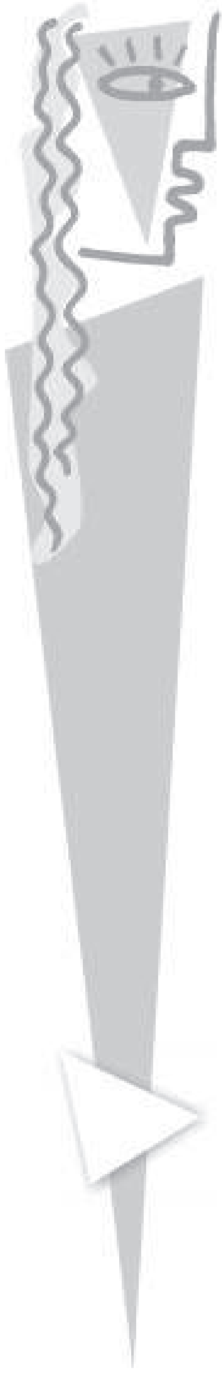

মুখের কথা একলা হয়ে
        রইল পড়ে গলির কোণে
ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু
ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।

বসন্তের কোকিল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করো। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না— তোমার মতো আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়— কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চশমার হাট লাগিয়া যায়,— কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নসীবাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলি-সংকুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়িতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘরবাড়ি আঁধার করিয়া তুলে— কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও 'অসুখ', এজন্য আসিতে পারিলেন না, কাহারও বড়ো সুখ— একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন?

তা ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাকো। ওই অশোকের ডালে বসিয়া রাঙা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মতো, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ওই পঞ্চম স্বরে, কু—উঃ বলিয়া ডাকো। তোমার ওই কু—উঃ রবটি আমি বড়ো ভালোবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই 'কু'— তবে যত পারো, ওই পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বলো, 'কু—উঃ'। যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে আমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, 'কু—উঃ'—কেন-না, তুমি সৌন্দর্যশূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও, 'কু—উঃ।' যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, 'কু—উঃ।' যখন দেখিবে, বকুলের অতিঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ 'কু—উঃ।' যখন দেখিবে, শুভ্র-মুখী, শুদ্ধশরীরা, সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক- প্রাখর্যের হ্রাস দেখিয়া ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে—স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকশিত করিবার উপক্রম করিতেছে,—যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—"আদরেতে আগুসারি"—কণ্ঠভরা গুন্‌গুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার 'কু—উঃ' বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িম্বশাখায় বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণে সেই লতার দোলানি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ওই পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ 'কু—উঃ!' ওইটি তোমার জিত—ওই পঞ্চম স্বর! নহিলে তোমার ও কু—উঃ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডস্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়,—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো

চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভালো। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন স্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেন্টে স্থান পাইলেন না কেন?

তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা পার্লিয়ামেন্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপ-মণ্ডিত, গিরিনদীনগরকুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ওই মহাসভা-গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম-স্বরে—কু—উঃ বলিয়া ডাকো—সিংহাসন হইতে হস্টিংস পর্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। 'কু—উঃ'! ভালো তাই; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বই-কি? সব কু। লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে। কু—উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ওই পঞ্চম-স্বরে কু বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি 'কু কু কু কু' বলিয়া আমার সুখের প্রভাত-নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চ্যাঁচাইলে হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—বে-পরদা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয়। সর্ জেম্স্ মাকিন্টশ্, তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন— আর মেকলে রেটরিকের পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভস্বর কে শুনে? দেখ, লোকের বৃদ্ধ পিতা-মাতার বেসুরো বকাবকিতে কোন্ ফল দর্শে? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কান টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলায় আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং পিড়িং বলেন, কি না?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে, তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট তাহাই পঞ্চম? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,—সুরের পঞ্চম, আর আলতাপরা ছোটো পায়ের গুজ্‌রী পঞ্চম। তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলে মিষ্ট।

কোন্ স্বর পঞ্চম, কোন্ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? এটি হাতির ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর—বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি? যদি কেহ পাখোয়াজ তানপুরা দাড়ি দাঁত লইয়া আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জন শুনিয়া মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে—

তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জল দুগ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গালার বৎস হন।

এখন আয়, পাখি! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস—আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দফতর লিখিয়া বেড়াই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলেমিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ওই গলা; আমার পুঁজিপাটা এই আফিঙের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চ-স্বর ভালোবাসিস—আমিও তাই; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস? আমিই বা কারে? বল দেখি, পাখি কারে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভালো, তাকেই ডাকি! যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকে ডাকি, এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস না, আমিও জানি না; তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্বশব্দগ্রাহী কোনো কর্ণ থাকে, তবে তোর আমার ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয়, ভাই, একবার মিলেমিশে দুই জনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

তবে কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাক দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখনও বলিতে পাইলাম না। যদি তোর ও ভুবন-ভুলানো স্বর পাইতাম, ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক দেখি রে! কী কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, এই কথাটি তুই বল দেখি রে! কমলাকান্তের মনের কথা, এ জন্মে বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ওই নীলাম্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ওই নক্ষত্রমণ্ডলীমধ্যে উড়িয়া, কখনও কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল আমার হয়ে একবার ডাক দেখি রে?

স্বদেশিকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশিপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশি শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশি গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কার্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি— লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইমস পত্রেও কোনো

পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া ব্রিটিশ রাজত্বের সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন এ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকতার সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে পোড়া বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা সুবিধাকর কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাক না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান করিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটি যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিতে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়।

আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা সে বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ামের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন— আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল। রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণিরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল— আমরা হত-আহত পশুপক্ষীর অতিতুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরানি রাশিকৃত লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ওই জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই, একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় না।

মানিকতলায় পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে

ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচ নির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালিকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন।" মালি তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া আন্।" সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণ-নির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্ণে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চিৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল, তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়ার মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড়বাদল থামিল তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুইধারের বনশ্রেণির মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দ মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুট ছাড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশলাই তৈরি করিতে হইবে, তাঁহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশলাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশলাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে— আমাদের ক-বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটি পল্লির সম্বৎসরের চুলা ধরানো চলিত। আরও একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল

না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, গেলাম তাহার কল দিখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না— কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারও চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকরো তৈরি হইয়াছে।" বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাকা ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি-একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবু সঙ্গো যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তার সঙ্গোও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমনকি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষপর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক দিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-এক দিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ দিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ

সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা আপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুইচক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গো হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গো মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না —

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর, জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম

স্বামী বিবেকানন্দ

আলাসিঙ্গার 'সি-সিক্‌নেস্' হল না। তু-ভায়া প্রথমে একটু আধটু গোল করে সামলে বসে আছেন। চারদিন—কাজেই নানা বার্তালাপ, 'ইষ্ট-গোষ্ঠী'তে কাটাল। সামনে কলম্বো। এই সিংহল, লঙ্কা। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজাকে জয় করেছিলেন। সেতু তো দেখেচি—সেতুপতি মহারাজার বাড়িতে, যে পাথরখানির উপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষকে প্রথম সেতুপতি-রাজা করেন, তাও দেখেচি। কিন্তু এ পাপ বৌদ্ধ সিলোনি লোকগুলি তো মানতে চায় না! বলে—আমাদের দেশে ও কিংবদন্তি পর্যন্ত নাই। আর নাই বললে কী হবে?—'গোসাঁইজি পুথিতে লিখছেন যে।' তার ওপর ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বলবে না, বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো—ঘাগরা-পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমান্‌ষী চেহারা! আবার—রোগা-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম-নরম শরীর! এরা রাবণ-কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে—বাংলা দেশ থেকে এসেছিল—তা ভালোই করেছিল। ওই যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমান্‌ষের তো বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারোর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরিতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন— ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্নমেন্ট কি ঘুমুচ্ছে গা? সেদিন 'পুরীতে' কাদের ধরাপাকড়া করতে গিয়ে হুলস্থুল বাধালে; বলি রাজধানীতে পাকড়া করে প্যাক করবারও যে অনেক রয়েছে।

একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙালি রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ বলে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে, নিজের মতো আরও কতকগুলো সঙ্গী জুটিয়ে জাহাজে করে ভেসে ভেসে লঙ্কা নামক টাপুতে হাজির। তখন ওদেশে বুনো জাতের

আবাস, যাদের বংশধরেরা এক্ষণে 'বেদ্দা' নামে বিখ্যাত। বুনো রাজা বড়ো খাতির করে রাখলে, মেয়ে বে দিলে। কিছু দিন ভালো মান্‌ষের মতো রইল; তারপর একদিন মাগের সঙ্গো যুক্তি করে, হঠাৎ রাত্রে সদলবলে উঠে বুনো রাজাকে সর্দারগণ সহিত কতল করে ফেললে। তারপর বিজয়সিংহ হলেন রাজা, দুষ্টুমির এইখানেই বড়ো অন্ত হলেন না। তারপর আর তাঁর বুনোর-মেয়ে রানি ভালো লাগল না। তখন ভারতবর্ষ থেকে আরও লোকজন, আরও অনেক মেয়ে আনালেন। অনুরাধা বলে এক মেয়ে তো নিজে করলেন বিয়ে, আর সে বুনোর মেয়েকে জলাঞ্জলি দিলেন; সে জাতকে জাত নিপাত করতে লাগলেন। বেচারিরা প্রায় সব মারা গেল, কিছু অংশ ঝাড়-জঙ্গালে আজও বাস করছে। এই রকম করে লঙ্কার নাম হল সিংহল, আর হল বাঙালি বদমাশের উপনিবেশ! ক্রমে অশোক মহারাজার আমলে তাঁর ছেলে মাহিন্দো আর মেয়ে সংঘমিত্তা সন্ন্যাস নিয়ে ধর্ম প্রচার করতে সিংহল টাপুতে উপস্থিত হলেন। এঁরা গিয়ে দেখলেন যে, লোকগুলি বড়োই আদাড়ে হয়ে গিয়েছে। আজীবন পরিশ্রম করে, সেগুলিকে যথাসম্ভব সভ্য করলেন, উত্তম উত্তম নিয়ম করলেন; আর শাক্যমুনির সম্প্রদায়ে আনলেন। দেখতে দেখতে সিলোনিরা বেজায় গোঁড়া বৌদ্ধ হয়ে উঠল। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড শহর বানালে, তার নাম দিলে অনুরাধাপুরম, এখনও সে শহরের ভগ্নাবশেষ দেখলে আক্কেল হয়রান হয়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ, ক্রোশ ক্রোশ পাথরের ভাঙা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আরও কত জঙ্গাল হয়ে রয়েছে, এখনও সাফ হয় নাই। সিলোনময় নেড়া মাথা, করোয়াধারী, হলদে চাদর-মোড়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পড়ল। জায়গায় জায়গায় বড়ো বড়ো মন্দির উঠল—মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্তি, জ্ঞান-মুদ্রা করে প্রচারমূর্তি, কাত হয়ে শুয়ে মহানির্বাণ-মূর্তি— তার মধ্যে। আর দ্যালের গায়ে সিলোনিরা দুষ্টুমি করলে নরকে তাদের কী হাল হয়, তাই আঁকা; কোনোটাকে ভূতে ঠেঙাচ্চে, কোনোটাকে করাতে চিরছে, কোনোটাকে পোড়াচ্চে, কোনোটাকে তপ্ত তেলে ভাজছে, কোনোটার ছাল ছাড়িয়া নিচ্চে— সে মহা বীভৎস কারখানা! এ 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু! চিনেও এই হাল; জাপানেও ওই। এদিকে তো অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখলে আত্মপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র বাড়িতে ঢুকেছে— চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাক্‌ড়া করে, বেদম পিটছে। তখন কর্তা দোতলা বারান্দায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিসনি, মারিসনি; অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' বাচ্চা-অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কী করা যায়?'

কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।' চোর জোড় হাত করে আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'আহা, কর্তার কী দয়া!'

বৌদ্ধরা বড়ো শান্ত, সকল ধর্মের উপর সমদৃষ্টি—এই তো শুনেছিলাম। বৌদ্ধ প্রচারকেরা আমাদের কলকাতায় এসে রং-বেরঙের গাল ঝাড়ে, অথচ আমরা তাদের যথেষ্ট পুজো করে থাকি। অনুরাধাপুরে প্রচার করছি একবার, হিঁদুদের মধ্যে—বৌদ্ধদের [মধ্যে] নয়—তাও খোলা মাঠে, কারোর জমিতে নয়। ইতোমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ 'ভিক্ষু'-গৃহস্থ, মেয়ে-মদ্দ, ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে সে যে বিটকেল আওয়াজ আরম্ভ করলে, তা আর কী বলব! লেক্‌চার তো 'অলমিতি' হল; রক্তারক্তি হয় আর কী! অনেক করে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, আমরা নয় একটু অহিংসা করি এস—তখন শান্ত হয়।

ক্রমে উত্তর দিক থেকে হিঁদু তামিলকুল ধীরে ধীরে লঙ্কায় প্রবেশ করলে। বৌদ্ধরা বেগতিক দেখে রাজধানী ছেড়ে, কান্দি নামক পার্বত্য শহর স্থাপন করলে। তামিলরা কিছু দিনে তাও ছিনিয়ে নিলে এবং হিন্দুরাজা খাড়া করলে। তারপর এল ফিরিঙ্গির দল, স্পানিয়ার্ড, পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ। শেষ ইংরেজ রাজা হয়েছেন। কান্দির রাজবংশ তাঞ্জোরে প্রেরিত হয়েছেন, পেনশন আর মুড়গ্‌তন্নির ভাত খাচ্চেন।

উত্তর-সিলোনে হিঁদুর ভাগ অনেক অধিক; দক্ষিণ ভাগে বৌদ্ধ, আর রং-বেরঙের দোআঁশলা ফিরিঙ্গি। বৌদ্ধদের প্রধান স্থান—বর্তমান রাজধানী কলম্বো, আর হিন্দুদের জাফনা। জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম। বৌদ্ধদের একটু আছে বে-থার সময়। খাওয়া-দাওয়ায় বৌদ্ধদের আদতে নেই; হিঁদুদের কিছু কিছু। যত কসাই, সব বৌদ্ধ ছিল। আজকাল কমে যাচ্ছে; ধর্ম প্রচার হচ্চে। বৌদ্ধদের অধিকাংশ ইউরোপী নাম ইন্দ্রুম-পিন্দ্রুম এখন বদলে নিচ্চে। হিঁদুদের সব রকম জাত মিলে একটা হিঁদু জাত হয়েছে; তাতে অনেকটা পাঞ্জাবি জাঠদের মতো সব জাতের মেয়ে, মায় বিবি পর্যন্ত বে করা চলে। ছেলে মন্দিরে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কেটে 'শিব শিব' বলে হিঁদু হয়। স্বামী হিঁদু, স্ত্রী ক্রিশ্চান। কপালে বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্বতীপতয়ে' বললেই ক্রিশ্চান সদ্য হিঁদু হয়ে যায়। তাতেই তোমাদের উপর এখানকার পাদরিরা চটা। তোমাদের আনাগোনা হয়ে অবধি, বহুৎ ক্রিশ্চান বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্বতীপতয়ে' বলে হিঁদু হয়ে জাতে উঠেছে। অদ্বৈতবাদ আর বীরশৈববাদ এখানকার ধর্ম। 'হিঁদু'-শব্দের জায়গায় 'শৈব' বলতে হয়। চৈতন্যদেব যে নৃত্যকীর্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেন, তার জন্মভূমি দাক্ষিণাত্য, এই তামিল জাতির মধ্যে। সিলোনের তামিল

ভাষা খাঁটি তামিল। সিলোনের ধর্ম, খাঁটি তামিল ধর্ম—সে লক্ষ লোকের উন্মাদ কীর্তন, শিবের স্তবগান, সে হাজারো মৃদঙ্গের আওয়াজ আর বড়ো বড়ো কত্তালের ঝাঁজ, আর এই বিভূতি-মাখা, মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ গলায়, পহনওয়ানি চেহারা, লাল চোখ, মহাবীরের মতো, তামিলদের মাতোয়ারা নাচ না দেখলে বুঝতে পারবে না।

কলম্বোর বন্ধুরা নাববার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল, অতএব ডাঙ্গায় নেবে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাশোনা হল। স্যার কুমারস্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তাঁর স্ত্রী ইংরেজ, ছেলেটি শুধু পায়ে, কপালে বিভূতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্-প্রমুখ বন্ধুবান্ধবেরা এলেন। অনেক দিনের পর মুড়গ্‌তন্নি খাওয়া হল, আর কিং-কোকোনাট। ডাব কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হল, তাঁর বৌদ্ধ মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল দেখলাম। কাউন্টেসের বাড়িটি মিসেস হিগিন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজান। কাউন্টেস্ ঘর থেকে টাকা এনেছেন, আর মিসেস্ হিগিন্স ভিক্ষে করে করেছেন। কাউন্টেস্ নিজে গেরুয়া কাপড় বাংলার শাড়ির মতো পরেন। সিলোনের বৌদ্ধদের মধ্যে ওই ঢঙ খুব ধরে গেছে দেখলাম। গাড়ি গাড়ি মেয়ে দেখলাম, সব ওই ঢঙের শাড়ি পরা।

বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ কান্দিতে দন্ত-মন্দির। ওই মন্দিরে বুদ্ধ-ভগবানের একটি দাঁত আছে। সিলোনিরা বলে, ওই দাঁত আগে পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে ছিল, পরে নানা হাঙ্গামা হয়ে সিলোনে উপস্থিত হয়। সেখানেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এখন নিরাপদে অবস্থান করছেন! সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেছে। আমাদের মতো নয়– খালি আষাঢ়ে গল্প। আর বৌদ্ধদের শাস্ত্র নাকি প্রাচীন মাগধী ভাষায়, এই দেশেই সুরক্ষিত আছে। এ স্থান হতেই ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশে ধর্ম গেছে। সিলোনি বৌদ্ধেরা তাদের শাস্ত্রোক্ত এক শাক্যমুনিকেই মানে, আর তাঁর উপদেশ মেনে চলতে চেষ্টা করে; নেপালি, সিকিম, ভুটানি, লাদাকি, চিনে, জাপানিদের মতো শিবের পূজা করে না; আর 'হ্রীং তারা' ওসব জানে না। তবে ভূতটুত নামানো আছে। বৌদ্ধেরা এখন উত্তর আর দক্ষিণ দু-আন্নায় হয়ে গেছে। উত্তর আন্নায়েরা নিজেদের বলে 'মহাযান'; আর দক্ষিণি অর্থাৎ সিংহলি ব্রহ্ম সায়ামি প্রভৃতিদের বলে 'হীনযান'। মহাযানওয়ালারা বুদ্ধের পূজা নামমাত্র করে; আসল পূজা তারাদেবীর, আর অবলোকিতেশ্বরের (জাপানি, চিনে ও কোরিয়ানরা বলে ক্বানয়ন্); আর 'হ্রীং ক্লীং' তন্ত্র-মন্ত্রের বড়ো ধুম; টিবেটীগুলো আসল শিবের ভূত। ওরা সব হিঁদুর দেবতা মানে, ডমরু বাজায়, মড়ার খুলি রাখে, সাধুর হাড়ের ভেঁপু বাজায়, মদ-মাংসের যম। আর খালি মন্ত্র আওড়ে রোগ-ভূত-প্রেত

তাড়াচ্চে। চিন আর জাপানে সব মন্দিরের গায়ে ‘ওঁ হ্রীং ক্লীং’—সব বড়ো বড়ো সোনালি অক্ষরে লেখা দেখেছি। সে অক্ষর বাংলার এত কাছাকাছি যে, বেশ বোঝা যায়।

আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে মাদ্রাজ ফিরে গেল। আমরাও কুমারস্বামীর (কার্তিকের নাম—সুব্রহ্মণ্য, কুমারস্বামী ইত্যাদি; দক্ষিণ দেশে কার্তিকের ভারী পূজা, ভারী মান; কার্তিক ওঁ-কারের অবতার বলে) বাগানের নেবু, কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং-কোকোনাট), দু-বোতল শরবত ইত্যাদি উপহার সহিত আবার জাহাজে উঠলাম।

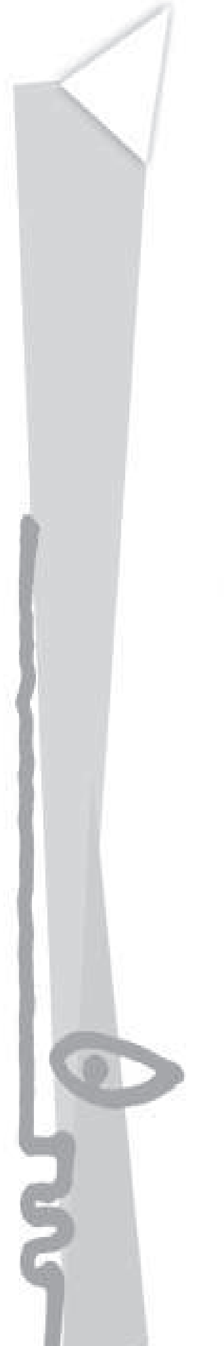

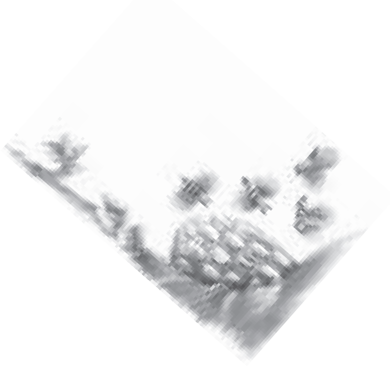

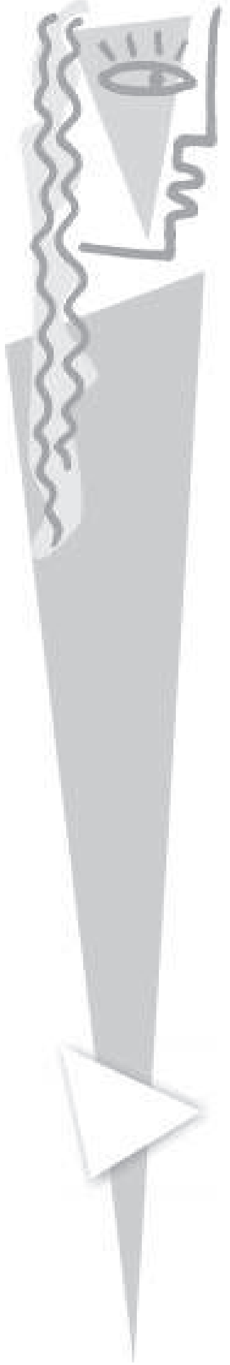

ভারতবর্ষ

এস. ওয়াজেদ আলি

পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার বয়স দশ-এগারো বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটে ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া-আসা করতে হত। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ত। বৃদ্ধের মাথায় মস্ত এক টাক, চারপাশে তার ধপধপে সাদা চুল, নাকে উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা, গম্ভীর শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞ লোকের মতো চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক-এক বার বৃদ্ধের কাছে এসে বসে পাঠ শুনত, আবার খদ্দের এলে, গিয়ে তাদের দেখা-শুনা করত। আমারই বয়সি একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর কাছে সর্বদা বসে থাকত। আর তার পাশে থাকত দুটি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনত। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হত, বিষয়টি তারা বিশেষভাবেই উপভোগ করছে।

বুড়ো কী পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হল। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম। রামচন্দ্র কী করে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন, তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলেদের মুখ আনন্দ আগ্রহ আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমি যখন সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম তখন কেউ না কেউ এসে আমায় ডেকে নিয়ে যেত। সেতু বাঁধা হচ্ছিল, তাই আমি জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কি না, আর পার হয়েই বা কী করেছিলেন, তা তখন জানতে পারিনি।

দু-চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে গেলুম। তারপর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম, তার ঠিকানা নেই। পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ আর সন্তান-সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটি মনের

কোন্ গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল। তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম! এমন কত শত জিনিস রোজ আমরা ভুলে যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘর বাড়ি সব বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে বড়ো বড়ো ম্যান্শন (mansion) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আগে দু-চারটে রিকশা আর ঘোড়ার গাড়িই সে পথ দিয়ে যেত, এখন বড়ো মোটর অনবরত যাওয়া আসা করছে। আগে মিটমিট করে গ্যাসের বাতি জ্বলত, এখন ইলেকট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। সেখানে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। জিনিসপত্র ঠিক আগের মতো সাজানো রয়েছে। চাল থেকে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে। বোধহয় পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি!

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে। পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মতো একটি বৃদ্ধ গদির উপর বসে মোটা একটি বই নিয়ে সাপ খেলানো সুরে কী পড়ছিল। পঁচিশ বছর আগের সেই মধ্যবয়স্ক লোকটির মতোই একটি মধ্যবয়স্ক লোক এক এক বার এসে সেই পাঠ শুনছিল আর আবশ্যক মতো খদ্দেরদের দেখা-শুনা করছিল। ঠিক সেই আগের ছেলেটির মতো একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসে ছিল। তার পাশে বসে ছিল সেই আগেকার মেয়েদের মতো দেখতে দুটি মেয়ে।

কোনো মায়ামন্ত্রবলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এল নাকি? আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কথা—পঁচিশ বছর আগে যা শুনেছিলুম।

আমি আর থাকতে পারলুম না, সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, 'মশায়, মাপ করবেন। ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়েনি, আর আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয়নি? রামচন্দ্র কি এখনও সেই সেতুবন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন?'

বৃদ্ধ তার চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। নাকের উপর থেকে চশমা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে গ্লাস দুটিকে ভালো করে পুঁছে আবার সেটিকে নাকের উপর চড়ালে। ধীর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে

নিলে, তারপর বিস্ময়ের স্বরে বললে, “পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?” আমি বললুম, “আজ্ঞে হ্যাঁ।” বৃদ্ধ বললে তা হলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতামহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলেমেয়েরা তার কাছে বসে পাঠ শুনত। ছেলেটি এখন ওই বড়ো হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতোই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামী পুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। এই ছেলেটি হচ্ছে আমার নাতি, আর এই মেয়ে দুটি আমার নাতনি—আমার ওই ছেলের সন্তান।

বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে বললুম, “এ বইটি কবেকার?”

স্মিত হাস্যে বৃদ্ধ বললে, “এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার ঠাকুরদাদা বটতলায় এটি কিনেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা, আমার তখন জন্ম হয়নি।”

বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলুম। মনে হল, আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি! প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। সেই Tradition সমানে চলছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটেনি।

সরস্বতী কুণ্ডী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সরস্বতী হ্রদকে কত রূপেই দেখিলাম! লোকে বলে সরস্বতী কুণ্ডীর জঙ্গালে বাঘ আছে, জ্যোৎস্না রাত্রে সরস্বতীর বিস্তৃত জলরাশির কৌমুদীস্নাত শোভা দেখিবার লোভে রাসপূর্ণিমার দিন তহশিলদার বনোয়ারীলালের চোখে ধুলা দিয়া আজমাবাদের সদর কাছারি আসিবার ছুতায় লবটুলিয়া ডিহি কাছারি হইতে লুকাইয়া একা ঘোড়ায় এখানে আসিয়াছি।

বাঘ দেখি নাই বটে, কিন্তু সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে। চারিধার নীরব নিস্তব্ধ— পূর্ব তীরের ঘন বনে কেবল শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছিল—দূরের শৈলমালা ও বনশীর্ষ অস্পষ্ট দেখাইতেছে— জ্যোৎস্নার হিম বাতাসে গাছপালা ও ভোমরা লতার নৈশপুষ্পের মৃদু সুবাস... আমার সামনে বন ও পাহাড়ে বেষ্টিত নিস্তরঙ্গা বিস্তীর্ণ হ্রদের বুকে হৈমন্তী পূর্ণিমার থই থই জ্যোৎস্না... পরিপূর্ণ, ছায়াহীন, জলের উপর পড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত হওয়া অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না... ভোমরা লতার সাদা ফুলে ছাওয়া বড়ো বড়ো বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরিদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে...

আর-এক ধরনের পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছিল—ঝিঁঝি পোকার মতো। দু-একটা পত্র পতনের শব্দ বা খস্ খস্ করিয়া শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া বন্য জন্তুর পলায়নের শব্দ...

বনদেবীরা আমরা থাকিতে তো আর আসে না। কত গভীর রাত্রে আসে কে জানে। আমি বেশি রাত পর্যন্ত হিম সহ্য করিতে পারি না। ঘণ্টাখানেক থাকিয়াই ফিরি।

সরস্বতী কুণ্ডীর এই পরিদের প্রবাদ এখানেই শুনিয়াছিলাম।

শ্রাবণ মাসে কেদিন আমাকে উত্তর সীমানার জরিপের ক্যাম্পে রাত্রি যাপন করিতে হয়। আমার সঙ্গে ছিল আমিন রঘুবর প্রসাদ। সে আগে গবর্নমেন্টের চাকুরি করিয়াছে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও এ অঞ্চলের বনের সঙ্গে তার পঁচিশ ত্রিশ বছরের পরিচয়।

তাহার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী ওখানে রাত্রে হুরি-পরিরা নামে, জ্যোৎস্নারাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ওইসব পাথরের ওপর, রেখে জলে নামে। সে সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরিদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মতো জেগে আছে। আমি দেখিনি কখনও, হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তারপর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে তাঁবুতে পরদিন সকালে তাঁর লাশ কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড়ো মাছে তাঁর একটা কান খেয়ে ফেলেছিল। হুজুর, ওখানে আপনি ওরকম যাবেন না।

এই সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে একদিন দুপুরে এক অদ্ভুত লোকের সন্ধান পাইলাম।

সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার পথে একদিন হ্রদের তীরের বনপথ দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছি, বনের মধ্যে দেখি একটি লোক মাটি খুঁড়িয়া কী যেন করিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম লোকটা ভুঁই-কুমড়া তুলিতে আসিয়াছে। ভুঁই-কুমড়া লতাজাতীয় উদ্ভিদ, মাটির মধ্যে লতার নীচে চালকুমড়ার আকারের প্রকাণ্ড কন্দ জন্মায়—উপর হইতে বোঝা যায় না। কবিরাজি ঔষধে লাগে বলিয়া বেশ দামে বিক্রয় হয়। কৌতূহলবশত ঘোড়া হইতে নামিয়া কাছে গেলাম, দেখি ভুঁই-কুমড়া নয়, কিছু নয়, লোকটা কীসের যেন বীজ পুঁতিয়া দিতেছে।

আমায় দেখিয়া সে থতোমতো খাইয়া অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বয়স হইয়াছে, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। সঙ্গে একটা চটের থলে, আর ভিতর হইতে ছোটো একখানা কোদালের আগাটুকু দেখা যাইতেছে, একটা শাবল পাশে পড়িয়া, ইতস্তত কতকগুলি কাগজের মোড়ক ছড়ানো।

বলিলাম—তুমি কে? এখানে কী করছ?

সে বলিল—হুজুর কী ম্যানেজারবাবু?

— হ্যাঁ। তুমি কে?

—নমস্কার। আমার নাম যুগলপ্রসাদ। আমি আপনাদের লবটুলিয়ার পাটোয়ারি বনোয়ারিলালের চাচাতো ভাই।

তখন আমার মনে পড়িল, বনোয়ারি পাটোয়ারি একবার কথায় কথায় তাহার চাচাতো ভাইয়ের কথা তুলিয়াছিল। উঠাইবার কারণ, আজমাবাদের সদর কাছারিতে—অর্থাৎ আমি যেখানে থাকি—সেখানে একজন মহুরির পদ খালি ছিল। বলিয়াছিলাম একটা ভালো লোক দেখিয়া দিতে। বনোয়ারি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, লোক তো তাহার সাক্ষাৎ চাচাতো ভাইই ছিল, কিন্তু লোকটা অদ্ভুত মেজাজের, একরকম খামখেয়ালি উদাসীন ধরনের। নইলে কায়েথি হিন্দিতে অমন হস্তাক্ষর, অমন পড়ালেখার এলেম এ অঞ্চলের বেশি লোকের নাই।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন, সে কী করে?

বনোয়ারি বলিয়াছিল—তার নানা বাতিক হুজুর, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক। কিছু করে না, বিয়ে শাদি করেছে, সংসার দেখে না, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অথচ সাধু-সন্নিসিও নয়, ওই এক ধরনের মানুষ।

এই তাহা হইলে বনোয়ারিলালের সেই চাচাতো ভাই?

কৌতূহল বাড়িল, বলিলাম— ও কী পুঁতছ ওখানে?

লোকটা বোধহয় গোপনে কাজটা করিতেছিল, যেন ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে এমন সুরে বলিল—কিছু না, এই একটা গাছের বীজ—

আমি আশ্চর্য হইলাম। কী গাছের বীজ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল, ইহার মাটিতে কী গাছের বীজ ছড়াইতেছে—তাহার সার্থকতাই বা কী? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিল—অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম একটা সাহেবের বাগানে ভারী চমৎকার বিলিতি লতা—বেশ রাঙা রাঙা ফুল। তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতা ফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝাড় বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে। লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বনভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই— কী অদ্ভুত লোকটা!

যুগলপ্রসাদকে ডাকিয়া এক গাছের তলায় দুজনে বসিলাম। সে বলিল—আমি এর আগেও এ কাজ করেছি হুজুর, লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের

লতা দেখেন, ও সব আমি আজ দশ বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ি জঙ্গাল থেকে এনে লাগিয়াছিলাম। এখন একেবারে ও-সব জঙ্গাল বেঁধে গিয়েছে।

—তোমার কি এ কাজ খুব ভালো লাগে?

—লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গালটা ভারী চমৎকার জায়গা—ওই সব ছোটোখাটো পাহাড়ের গায়ে কি এখানকার বনে ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাব, এ আমার বহুদিনের শখ।

—কী ফুল নিয়ে আসতে?

—কী করে আমার এদিকে মন গেল, তা একটু আগে হুজুরকে বলি। আমার বাড়ি ধরমপুর অঞ্চলে। আমাদের দেশে বুনো ভাণ্ডারী ফুল একেবারেই ছিল না। আমি মহিষ চরিয়ে বেড়াতাম ছেলেবেলায় কুশিনদীর ধারে ধারে, আমার গাঁ থেকে দশ পনেরো ক্রোশ দূরে। সেখানে দেখতাম বনে জঙ্গালে, মাঠে বুনো ভাণ্ডীর ফুলের বড়ো শোভা। সেখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে দেশে লাগাই, এখন আমাদের অঞ্চলের পথের ধারে বনঝোপে কি লোকের বাড়ির পেছনে পোড়ো জমিতে ভাণ্ডারী ফুলের একেবারে জঙ্গাল, সেই থেকে আমার এই দিকে মাথা গেল। যেখানে যে ফুল নেই, সেখানে সেই ফুল গাছ, লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার শখ। সারাজীবন ওই করে ঘুরেছি। এখন আমি ও-কাজে ঘুণ হয়ে গেছি।

যুগলপ্রসাদ দেখিলাম এদেশের বহু বনের ফুল ও সুদৃশ্য বৃক্ষলতার খবর রাখে। এ বিষয়ে সে যে একজন বিশেষজ্ঞ, তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ রহিল না। বলিলাম—তুমি এরিস্টলোকিয়া লতা চেন?

তাহাকে ফুলের গড়ন বলিতেই সে বলিল, হংস-লতা? হাঁসের মতো চেহারার ফুল হয় তো? ও তো এদেশের গাছ নয়। পাটনায় দেখেছি বাবুদের বাগানে।

তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্যের এমন পূজারিই বা কটা দেখিয়াছি? বনে বনে ভালো ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোনো স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরিব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্‌বেগ।

আমায় বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর মতো চমৎকার বন এ অঞ্চলে কোথাও নেই বাবুজি। কত গাছপালা যে আছে, আর কী দেখেছেন জলের শোভা! আচ্ছা, আপনি কি বিবেচনা করেন এতে পদ্ম হবে পুঁতে দিলে? ধরমপুরের পাড়াগাঁ অঞ্চলে পদ্ম আছে অনেক পুকুরে। ভাবছিলাম গেঁড় এনে পুঁতে দেব।

আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সংকল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এ বনকে নানা নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাব, সেদিন হইতে ইহা আমাকে যেন একটা নেশার মতো পাইয়া বসিল। যুগলপ্রসাদ খাইতে পায় না, সংসারে বড়ো কষ্ট, ইহা আমি জানতাম। সদরে লিখিয়া তাহাকে দশ টাকা বেতনে একটা মুহুরির চাকুরি দিলাম আজমাবাদ কাছারিতে।

সেই বছরে আমি কলকাতা হইতে সাটনের বিদেশি বন্যপুষ্পের বীজ আনিয়া ও ডুয়ার্সের পাহাড় হইতে বন্য জুঁইয়ের লতার কাটিং আনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রোপণ করিলাম সরস্বতী হ্রদের বনভূমিতে। কী আহ্লাদ ও উৎসাহ যুগলপ্রসাদের। আমি তাহাকে শিখাইয়া দিলাম, এ উৎসাহ ও আনন্দ যেন সে কাছারির লোকের কাছে প্রকাশ না করে। তাহাকে তো লোকে পাগল ভাবিবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দিবে না। পর বৎসর বর্ষার জলে আমাদের রোপিত গাছ ও লতার ঝাড় অদ্ভুতভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। হ্রদের তীরের জমি অত্যন্ত উর্বর, গাছপালাগুলি যাহা পুঁতিয়াছিলাম, এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী। কেবল সাটনের বীজের প্যাকেট লইয়া গোলমাল বাধিয়াছিল। প্রত্যেক প্যাকেটের উপর তাহারা ফুলের নাম ও কোনো কোনো স্থলে এক লাইনে ফুলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়াছিল। ভালো রং ও চেহারা বাছিয়া বাছিয়া যে বীজগুলি লাগাইলাম, তাহার মধ্যে 'হোয়াইট বিম' ও 'রেড ক্যাম্পিয়ান' এবং 'স্টিচওয়ার্ট' অসাধারণ উন্নতি দেখাইল। 'ফক্সগ্লাভ' ও 'উড অ্যানিমোন্' মন্দ হইল না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও 'ডগ রোজ' বা 'হনিসাকল্'-এর চারা বাঁচাইতে পারা গেল না।

হলদে ধুতরা জাতীয় এক প্রকার গাছ হ্রদের ধারে ধারে পুঁতিয়াছিলাম। খুব শীঘ্রই তাহার ফুল ফুটিল। যুগলপ্রসাদ পূর্ণিয়ার জঙ্গল হইতে বন্য বয়ড়া লতার বীজ আনিয়াছিল, চারা বাহির হইবার সাত মাসের মধ্যেই দেখি কাছাকাছি অনেক ঝোপের মাথা বয়ড়া লতায় ছাইয়া যাইতেছে। বয়ড়া লতার ফুল যেমন সুদৃশ্য, তেমনি তাহার মৃদু সুবাস।

হেমন্তের প্রথমে একদিন দেখিলাম বয়ড়া লতায় অজস্র কুঁড়ি ধরিয়াছে।

যুগলপ্রসাদকে খবরটা দিতেই সে কলম ফেলিয়া আজমাবাদ কাছারি হইতে সাতমাইল দূরবর্তী সরস্বতী হ্রদের তীরে প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতেই আসিল।

আমায় বলিল— লোকে বলেছিল হুজুর, বয়ড়া লতা জন্মাবে, বাড়বেও বটে, কিন্তু ওর ফুল ধরবে না। সব লতায় না কি ফুল ধরে না। দেখুন কেমন কুঁড়ি এসেছে!

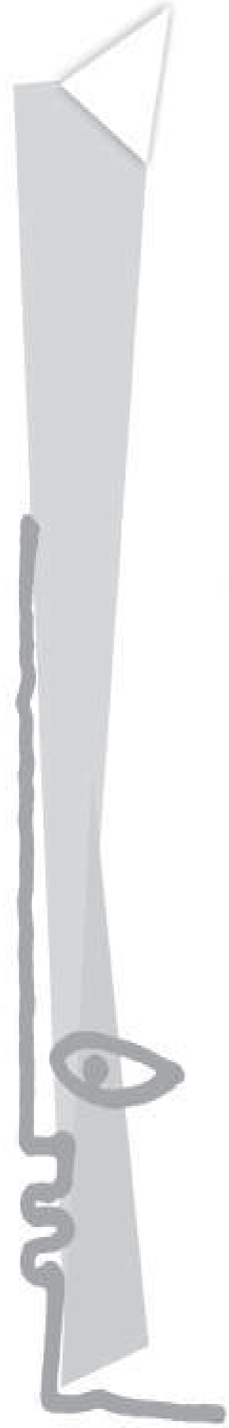

হ্রদের জলে 'ওয়াটার ক্রোফ্ট' বলিয়া এক প্রকার জলজ ফুলের গেঁড় পুঁতিয়াছিলাম। সে গাছ হু-হু করিয়া এত বাড়িতে লাগিল যে, যুগলপ্রসাদের ভয় হইল জলে পদ্মের স্থান বুঝি ইহার বেদখল করিয়া ফেলে!

বোগেনভিলিয়া লতা লাগাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শহরের শৌখিন পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে এতই ওর সম্পর্কটা জড়ানো যে আমার ভয় হইল, সরস্বতী কুণ্ডীর বনে ফুলেভরা বোগেনভিলিয়ার ঝোপ ইহার বন্য আকৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যুগলপ্রসাদেরও এসব বিষয়ে মত আমার ধরনের। সেই বারণ করিল।

অর্থব্যয়ও কম করি নাই। একদিন গনোরী তেওয়ারির মুখে শুনিলাম, কারো নদীর ওপারে জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গালে এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের বন্যপুষ্প হয়—ওদেশে তার নাম দুধিয়া ফুল। হলুদ গাছের মতো পাতা, অত বড়োই গাছ—খুব লম্বা একটা ডাঁটা ঠেলিয়া উঁচুদিকে তিন-চার হাত ওঠে। একটা গাছে চার-পাঁচটা ডাঁটা হয়, প্রত্যেক ডাঁটায় চারটি করিয়া হলদে রঙের ফুল ধরে—দেখিতে খুব ভালো তো বটেই, ভারী সুন্দর তার সুবাস। রাত্রে অনেক দূর পর্যন্ত সুগন্ধ ছড়ায়। সে ফুলের একটা গাছ যেখানে একবার জন্মায়, দেখিতে দেখিতে এত হু হু করিয়া বংশবৃদ্ধি হয় যে, দু তিন বছরে রীতিমতো জঙ্গাল বাঁধিয়া যায়।

শুনিয়া পর্যন্ত আমার মনের শান্তি নষ্ট হইল। ওই ফুল আনিতেই হইবে। গনোরী বলিল, বর্ষাকাল ভিন্ন হইবে না, গাছের গেঁড় আনিয়া পুঁতিতে হয়—জল না পাইলে মরিয়া যাইবে।

পয়সা-কড়ি দিয়া যুগলপ্রসাদকে পাঠাইলাম। সে বহু অনুসন্ধানে জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গাল হইতে দশ-বারো গণ্ডা গেঁড় জোগাড় করিয়া আনিল।

নেতাজি

সৈয়দ মুজতবা আলি

আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মতো মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অন্ধের হস্তী-দর্শনের ন্যায়। তৎসত্ত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মতো অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য ওই একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অন্ধত্বের চরমে পৌঁছিয়ে দেয়—শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তর লেখককেও বাচাল করে তোলে।

দ্বিতীয় কারণ, এক চিনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার পাত্র ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ ইজ স্মল—বাট আই ড্রিঙ্ক অফতেনার (My cup is small but I drink ofterner)।'

আমাদের পাত্র ছোটো, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর নাই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গণ্ডূষ জল, অথবা বলব, আমি অন্ধ, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অন্ধই ভাবে, সেই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে, কাজেই এ-অন্ধের অমিত আত্মম্ভরিতাপ্রসূতও হতে পারে।

প্রথম, বর্মায় সুভাষচন্দ্র কী কৌশলে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে এক করতে পেরেছিলেন? এবং শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে ফেরার পরও এঁদের অধিকাংশ অখণ্ডবাহিনীরূপে আত্মপরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি, সুভাষচন্দ্রের সাইগন আসার বহুপূর্বে রাসবিহারী বসু অনেক চেষ্টা করেও কোনো আজাদ হিন্দ

ফৌজ গড়ে তুলতে পারেননি। অথচ রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের তুলনায় জাপানিদের কাছে অনেক পরিচিত ছিলেন—জাপান-ফেরতা ভারতীয়দের মুখে শুনেছি রাসবিহারী বসুকে জিজ্ঞাসা না করে জাপান সরকার কখনো কোনো ভারতীয়কে জাপানে থাকবার ছাড়পত্র মঞ্জুর করত না।

একদিকে যেমন দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ' নামটি অনায়াসে সর্বজনপ্রিয় করে তুললেন, অন্যদিকে দেখি, কৃতজ্ঞ মুসলমানেরা তাঁকে 'নেতাজি' নাম দিয়ে হৃদয়ে তুলে নিয়েছে—'কাইদ-ই-আকবর' বা ওই জাতীয় কোনো দুরূহ আরবি খেতাব তাঁকে দেওয়ার প্রয়োজন তারা বোধ করেনি। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, তখন এ-দেশে হিন্দি-উর্দু সমস্যা কংগ্রেসকে প্রায়ই বিচলিত করত, অথচ দেখি সুভাষচন্দ্রকে এ সমস্যা একবারের তরেও কাতর করতে পারেনি। বেতারে আমি সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব বক্তৃতাই শুনেছি এবং প্রতিবারই বিস্ময় মেনেছি হিন্দি-উর্দুর অতীত এ ভাষা নেতাজি শিখলেন কী করে? নেতাজি তো শব্দতাত্ত্বিক ছিলেন না, ভাষার কলাকৌশল আয়ত্ত করবার মতো অজস্র সময়ও তো তাঁর ছিল না। এ-রহস্যের একমাত্র সমাধান এই যে, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে মহাত্মার থাকে, দেশকে সত্যই যিনি প্রাণ মন সর্বচৈতন্য সর্বানুভূতি দিয়ে ভালোবাসেন, সাম্প্রদায়িক কলহের বহু ঊর্ধ্বে নির্দ্বন্দ্ব পুণ্যলোকে যিনি অহরহ বিরাজ করেন, যে মহাপুরুষ দেশের অখণ্ড সত্যরূপ ঋষির মতো দর্শন করেছেন, বাক্যব্রহ্ম তাঁর ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করেন। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন, সে-ভাষা সত্যের ভাষা, ন্যায়ের ভাষা, প্রেমের ভাষা। সে-ভাষা শুদ্ধ হিন্দি অপেক্ষাও বিশুদ্ধ হিন্দি, শুদ্ধ উর্দু অপেক্ষাও বিশুদ্ধ উর্দু। সে-ভাষা তাঁর নিজস্ব ভাষা। এই ভাষাই মহাত্মাজির আদর্শ ভাষা ছিল।

নিজের মনকে বহুবার প্রশ্ন জিজ্ঞসা করেছি, সুভাষচন্দ্র না হয় সর্বদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৈন্যকে তিনি কী করে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করলেন? সে উত্তর শেষপর্যন্ত গ্রহণ করেছি, সেটা ঠিক কি না জানি না; আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র শুদ্ধ মাত্র সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য কখনো কোমর বেঁধে আসরে নামেনি। আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র এমন এক বৃহত্তর জাজ্বল্যমান আদর্শ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, এমন এক সর্বজনগ্রহণীয় বীরজনকাম্য পন্থা দেখাতে পেরেছিলেন যে, কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী শিখ সকলেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। আমি

যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র বলছেন, 'আগুন লেগেছে, চলো আগুন নেভাই, এই আমার হাতে জল। তোমরাও জল নিয়ে এসো।' সুভাষচন্দ্র কিন্তু এ কথা বলছেন না, 'আগুন নেভাতে হলে হিন্দু-মুসলমানকে প্রথমে এক হতে হবে, তারপর আগুন নেভানো হবে। এসো প্রথমে মিটিং করি, প্যাক্ট বানাই, সিলমোহর লাগাই, তারপর স্বরাজ।'

বৃহত্তর আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেছে,— তা সে দ্বিতীয় যে গজদন্ত আমি অনুভব করতে পেরেছি, সেটি এই :

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম জেরুজালামের গ্র্যান্ডমুফতি এবং দ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশিদ। এঁদের দু-জনই আপন আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজি। তিনি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না।

তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন যশ এবং চরিত্রবল। প্রথম দুজনের স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষপর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনো সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুনিসিয়া আলজেরিয়ায় ইংরেজের সঙ্গে লড়তে পারলেন না; শুধু তাই নয়, জার্মান রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে বেরুলেন, তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মতো ইতালি থেকে বেতারযোগে আরবিতে বক্তৃতা দিয়ে 'প্রোপাগ্যান্ডা' করার।

অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কী অলৌকিক কর্ম সমাধান করলেন! স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, ইংরেজের 'গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের' এক করে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার ভারবাসী সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যগণ যেন জাপানি ঝান্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতি এবং আবদুর রশিদ জার্মানিকে সে সুযোগ দিতেও বাধ্য করাতে পারেননি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে-রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম। যদি চাও, তবে সে-রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা

অর্জন করতে পারো। যদি ইচ্ছা হয়, তবে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পারো— এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে রকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয় কিন্তু আমি কোনো ভিক্ষা চাই না।' তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, জাপান তাঁর কথামতো চলতে বাধ্য হবে। তার সঙ্গো সঙ্গো আরও কত গুণ, কত কূটবুদ্ধি, কত দুঃসাহস, কত নির্বিকার ধৈর্য, কত চরিত্রবলের প্রয়োজন হয়েছিল, আমাদের মতো সাধারণ লোক কি তার কল্পনাও করতে পারে?

কপর্দহীন, সামর্থ্যসম্বলহীন সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে একা দাঁড়িয়ে—প্রথম দেখি এই ছবি। তারপর দেখি, সেই সুভাষচন্দ্র নেতাজিরূপে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে, ভারতেরই এক কোণে।

যতই বিশ্লেষণ করি না কেন, এই দুই ছবির মাঝখানের পর্যায়গুলো ইন্দ্রজাল— ভানুমতীই থেকে যায়। এ যুগে না জন্মে এ কাহিনি ইতিহাসে পড়লে কখনোই বিশ্বাস করতুম না।

"জিন্দাবাদ নেতাজি।"

ডাইনি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

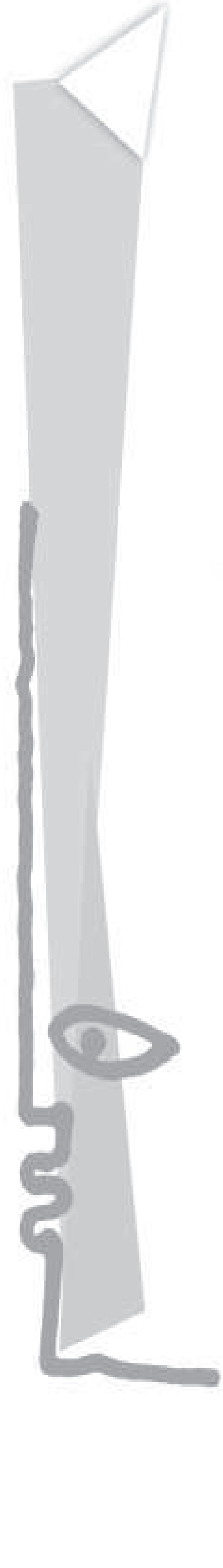

কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু নামটি আজও পূর্ণগৌরবে বর্তমান; —ছাতি-ফাটার মাঠে জলহীন, ছায়াশূন্য, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মতো মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে। তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নামগৌরবে মহামারির সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মতো ধুলার একটা ধূসর আস্তরণ মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের মসিরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত ভয়ংকর! শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য-নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। ফ্যাকাশে রঙের নরম ধুলার রাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড়ো প্রান্তরটায় এখানে-ওখানে কতকগুলি খৈরি ও শেয়াকুল জাতীয় কন্টকগুল্ম। কোনো বড়ো গাছ নাই— বড়ো গাছ এখানে জন্মায় না; কোথাও জল নাই, —গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।

মাঠখানির চারিদিকেই ছোটো ছোটো পল্লি— সবই নিরক্ষর চাষিদের গ্রাম; সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না— তাহারা বলে কোন্ অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চরমাণ

পতঙ্গ-পক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরা-পাতার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রাসের মধ্যে।

সে নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি-ফাটার মাঠ। ভাগ্যদোষে ওই বিষজর্জরতার উপরে আর-এক ক্রূরদৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। মাঠখানার পূর্বপ্রান্তে দলদলির জলা, অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর পঙ্কিল ঝরনা-জাতীয় জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী— ভীষণ শক্তিশালিনী, নিষ্ঠুর, ক্রূর এক বৃদ্ধা ডাকিনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে, তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টি না কি অপলক স্থির আর সে দৃষ্টি না কি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবন্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর।

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘরখানার মুখ ওই ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে-ছায়া বারান্দা। সেই বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ওই ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার কাজের মধ্যে সে আপন ঘর দুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই-তিনটা বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়। লোকে ভয়ে ভয়ে ভিক্ষা বেশি পরিমাণেই দিয়া থাকে ; সের খানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ি ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্ধেক বিক্রি করিয়া দোকান হইতে একটু নুন, একটু সরিষার তেল, আর খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে। বাড়ি ফিরিয়া আর একবার বাহির হয় শুকনো গোবর ও দুই- চারিটা শুকনো ডালপালার সন্ধানে। ইহার পর সমস্তটা দিন সে দাওয়ার উপর নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। এমনি করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ওই মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ি সে কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে এ কথা না কি নিঃসন্দেহ যে, তিন-চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফাটার নির্জন রূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে। নির্জনতাই উহারা ভালোবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।

মানুষ দেখিলে যে অনিষ্ট স্পৃহা জাগিয়া উঠে! ওই সর্বনাশী লোলুপ শক্তিটা সাপের মতো লকলকে জিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া উঠে। না হইলেও সেও তো মানুষ।

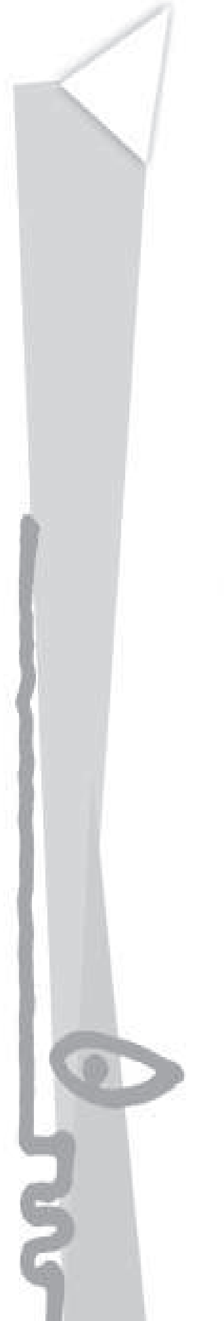

আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া উঠে। বহুকালের পুরোনো একখানি আয়না—সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজের ভয় হয়—ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গাল দুইটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মতো একটা ঝকমকে ধার! জরা-কুঞ্চিত মুখ, শনের মতো সাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানির চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কী সুন্দর লালচে রং, আর কী পালিশই না ছিল। আর আয়নার কাচখানা ছিল রোদ-চকচকে পুকুরের জলের মতো। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কী পরিষ্কারই না দেখা যাইত। ছোটো কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল— ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে; কপালের নীচেই টিকোলো নাক; চোখ দুইটি ছোটোই ছিল— চোখের তারা দুইটিও খয়রা রঙেরই ছিল— লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় করিত। কিন্তু তাহার বড়ো ভালো লাগিত, ছোটো চোখ দুইটি আরও একটু ছোটো করিয়া তাকাইলে মনে হইত, আকাশের কোল পর্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায়। অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল—নরুন দিয়া চেরা, ছুরির মতো চোখে, বিড়ালীর মতো এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভালো লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না। কোথা দিয়া যে কী হইয়া যায়, কেমন করিয়া যে হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না ; তবে হইয়া যায়।

প্রথম দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

বুড়া শিবতলার সম্মুখেই দুর্গাসায়রের বাঁধাঘাটের ভাঙা রানার উপর সে দাঁড়াইয়া ছিল— জলের তলে তাহার ছবি উলটা দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া জলের ঢেউয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া লম্বা হইয়া যাইতেছিল—জল স্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহার মতো দশ-এগারো বৎসরের মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ বামুনবাড়ির হারু চৌধুরি আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া শান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর তাহাকে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার সে রূঢ় কণ্ঠস্বর সে এখনও শুনিতে পায়— হারামজাদি ডাইনি, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড়ো বাড়? খুন করে ফেলব হারামজাদিকে।

হারু সরকারের সে ভয়ংকর মূর্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে।

সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল— ওগো বাবু গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো!

আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে যদি তোর লোভই হয়েছিল, তবে সে কথা বললিনে কেন হারামজাদি?

হাঁ, লোভ তো তাহার হইয়াছিল, সত্যই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা তো জলে ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিল!

হারামজাদি, আমার ছেলে যে পেট বেদনায় ছটফট করছে।

সে আজও অবাক হইয়া যায়, কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল— কেমন করিয়া এমন হয়! কিন্তু এ যে সত্য তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই! তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, সে হারু সরকারের বাড়ি গিয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়াছিল, আর বারবার মনে মনে বলিয়াছিল— হে ঠাকুর, ভালো করে দাও, ওকে ভালো করে দাও। কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল— দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি, এই লইলাম। আশ্চর্যের কথা, কিছুক্ষণ পরেই বার দুই বমি করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সরকার বলিয়াছিল, ওকে একটা আম আর দুটি মুড়ি দাও দেখি।

সরকার-গিন্নি একটা ঝাঁটা তুলিয়াছিল, বলিয়াছিল, ছাই দেব, হারামজাদির মুখে। মা-বাপ-মরা অনাথা মেয়ে বলে দয়া করি— যেদিন হারামজাদি আসে সেই দিনই আমি ওকে খেতে দিই। আর ও কি না আমার ছেলেকে নজর দেয়! আবার দাঁড়িয়ে শুনছে দ্যাখো! ওর ওই চোখের দৃষ্টি দেখে বরাবর আমার সন্দেহ ছিল, কখনও আমি ওর সাক্ষাতে ছেলেপুলেকে খেতে দিইনি। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে ঘাটে গিয়েছি, আর ও কখন এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কী দিষ্টি ওর!

লজ্জায় ভয়ে সে পালাইয়া গিয়াছিল। সেদিন রাত্রে সে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ির দাওয়ায় শুইতে পারে নাই; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ওই বুড়া শিবতলায়। অঝোরঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল আর বলিয়াছিল— হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টিকে ভালো করে দাও, না হয় আমাকে কানা করে দাও।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির মূর্তির মতো নিস্পন্দ বৃদ্ধার অবয়বের মধ্যে এতক্ষণে ক্ষীণ একটি চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূর্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই—দেবতার দোষই বা কী, আর সাধ্যই বা কী? বেশ মনে আছে, গৃহস্থের বাড়িতে সে আর ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহির দুয়ার হইতেই সে ভিক্ষা চাহিত—গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাহিত না,

কোনোমতে বহুকষ্টে বলিত, দুটি ভিক্ষে পাই মা! হরিবোল!

কে রে? তুই বুঝি? খবরদার ঘরে ঢুকবিনে। খবরদার!

না মা, ঘরে ঢুকব না মা।

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে কী যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠত, এখনও উঠে। কী সুন্দর মাছভাজার গন্ধ, আহা! বেশ খুব বড়ো পাকা-মাছের খানা বোধহয়।

এই—এই! হারামজাদি বেহায়া! উঁকি মারছে দ্যাখো! সাপের মতো।

ছি ছি ছি! সত্যি তো সে উঁকি মারিতেছে—রান্নাশালার সমস্ত আয়োজন তাহার নরুন-চেরা ক্ষুদ্র চোখের এক দৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে। মুখের ভিতর জিভের তলা হইতে ঝরনার মতো জল উঠিতেছে।

বহুকালের গড়া জীর্ণ বিবর্ণ মাটির মূর্তি যেন কোথায় একটা নাড়া পাইয়া দুলিয়া উঠিল; ফাট-ধরা শিথিলগ্রন্থি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খলাহীন অসমগতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িল, অস্থিরবাবে বৃদ্ধ এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল—বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয়, সে-কথা সারাজীবন ধরিয়াও সে বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিত্তের নিকট সমস্ত পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায়।

কিন্তু সে তার কী করিবে? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে, তার কী করিবে, কী করিতে পারে? প্রহৃত পশু যেমন মরিয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ-আঁ গর্জন করিয়া উঠে, ঠিক তেমনই ইঁ-ইঁ শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শনের মতো চুলগুলাকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে নরুন-চেরা চোখের চিলের মতো দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ভরিয়া ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্রমাস, বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠ ভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মতো কী একটা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা ফুৎকার যদি সে দেয়, তবে মাঠের ধুলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে।

ওই ধোঁয়ার মধ্যে জমাট সাদার মতো ওটা কী, নড়িতেছে যেন! মানুষ? হ্যাঁ মানুষই তো! মনের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। ফুঁ দিয়া ধুলা উড়াইয়া, দিবে মানুষটাকে উড়াইয়া? হি-হি-হি করিয়া পাগলের মতো হাসিয়া একটা অবোধ নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

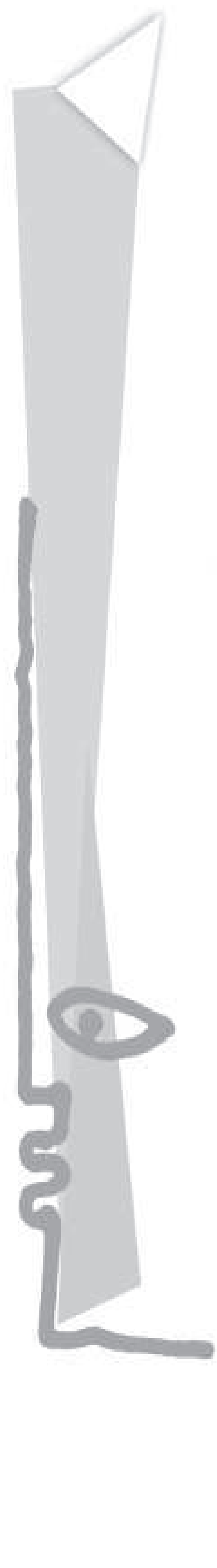

দু-হাতের মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল— না-না-না। ছাতি-ফাটার মাঠে মানুষটা ধুলার গরমে শ্বাসরোধী ঘনত্বে মরিয়া যাইবে।

নাঃ, ওদিকে আর সে চাহিবেই না। তাহার চেয়ে বরং উঠানটায় আর একবার ঝাঁটা বুলাইয়া, ছড়াইয়া-পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলাকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই সে ভাঙিয়া-পড়া দেহখানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে শুরু করিল।

জড়ো-করা পাতাগুলো ফর-ফর করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঝাঁটার মুখে টানিয়া-আনা ধুলার রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়িকেই যেন জড়াইয়া ধরিতেছিল, মুখে-চোখে ধুলা মাখাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়া দ্রুত আবর্তিত পাতাগুলা তাহাকে যেন সর্বাঙ্গে প্রহার করিতেছে। জরাগ্রস্ত রোমহীন আহতা মার্জারীর মতো ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটা গাছটা আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো বেরো বেরো।

বারবার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ওই আবর্তটাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল, আবর্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধুলা হু হু করিয়া উড়িয়া ধুলার একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে! শুধু কী একটা? এখানে ওখানে ছোটো বড়ো কত ঘুরণপাক উঠিয়া পড়িয়াছে— মাঠটা যেন নাচিতেছে। একটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে! একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মতো অধীর হইয়া উঠিল; সহসা সে ন্যুব্জ দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধ্যমতো গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোনো অতলের দিক ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তিও তাহার ছিল না। ছোটোশিশুর মতো হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে।

কে রইছ গো ঘরে? ওগো।

জলে- পচা নরম মরা-ডালের মতো বৃদ্ধা বাঁকিয়া-চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়াছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোনোমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল, কে?

ধূলিধূসরদেহে শুষ্ক-পাণ্ডুর মুখ একটি যুবতি মেয়ে বুকের ভিতর কোনো একটা বস্তু কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহুকষ্টে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধ হয়

ছাতি-ফাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল, একটুকুন জল।

মাটির উপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। মেয়েটির শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আহা হা, বাছা রে আয় আয়। বোস!

সভয়ে সন্তপর্ণে দাওয়ার এক পাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল, একটুকুন জল দাও গো! মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড়ো একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া এক টুকরো পাটালির সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুরিয়া বলিল, আহা মা, এই রোদে ওই রাক্ষুসি মাঠে কী বলে বের হলি তুই?

বাহিরে বসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, আমার মায়ের বড়ো অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে। মাঠের মাথায় এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তু এসে পড়লাম একেবারে মধ্যিখানে।

জলের ঘটি ও পাটালির টুকরাটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল—মেয়েটির পাশে একটি শিশু। গরম জলে সিদ্ধ শাকের মতো শিশুটি ঘর্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল, দে, দে বাছা, ছেলেটার চোখে মুখে জল দে। মেয়েটি ছেলের মুখে চোখে জল দিয়া আঁচল ভিজাইয়া সর্বাঙ্গ মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে বসিয়া ছেলেটির দিকে তাকাইয়া রহিল; স্বাস্থ্যবতী যুবতি মায়ের প্রথম সন্তান বোধ হয়, হৃষ্টপুষ্ট নদর দেহ— কচি লাউডগার মতো নরম সরস। দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, নরম গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে।

এঃ, ছেলেটা কী ভীষণ ঘামিতেছে! দেহের সমস্ত জলই কি বাহির হইয়া আসিতেছে! চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। তবে কী—? কিন্তু সে তাহার কী করিবে? কেন তাহার সামনে আসিল? কেন আসিল? ওই কোমল নধরদেহ শিশু ময়দার মতো ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল-বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া—। জীর্ণ জরজর ত্বকের উপর একটা রোমাঞ্চিত শিহরন ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এঃ ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসাস্বাদ। যাঃ! নিতান্ত অসহায়ের মতো আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল, খেয়ে ফেললাম—ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে। পালা পালা, তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি।

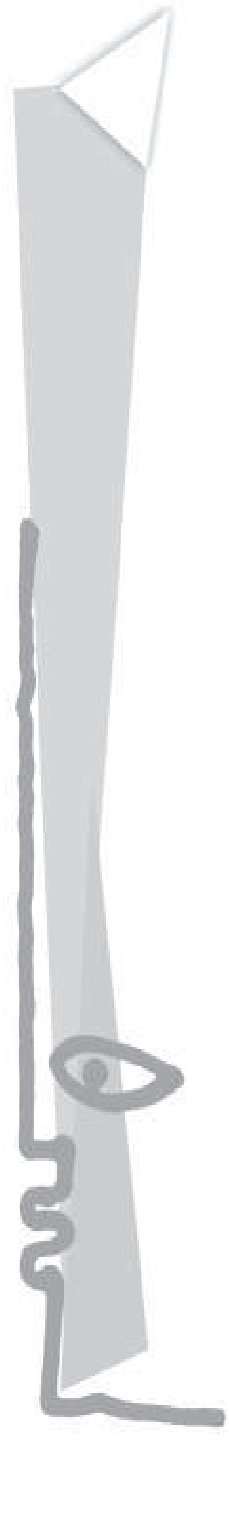

শিশুটির মা ওই যুবতি মেয়েটি দুই হাতে ঘটি তুলিয়া ঢকঢক করিয়া জল খাইতেছিল— তার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া পড়িয়া গেল; সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধার বিস্ফারিত-দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল; এটা তবে রামনগর? তুমিই সেই—? সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছেলেটিকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া যেন পক্ষিণীর মতো ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে কী করিবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ওই লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি! কাল সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন্ মুখে? লোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না, সে তাহা জানে; কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যে-কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে চোখে দেখিবে কী করিয়া? ছেলেমেয়েরা এমনিই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়াও উঠে; আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধহয় আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে। ছি ছি ছি!

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাত্রে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া ছিল, সে দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে তো অনেকটা ডাগর হইয়াছে। তাহারই বয়সি তাহাদেরই স্বজাতীয় সাবিত্রীর পূর্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে-রোদ লইতেছিল। ছেলেটি শুইয়া ছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কী সুন্দর ছেলেটি।

ঠিক এমনিভাবেই, ঠিক আজিকার মতোই সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল, ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া নরম ময়দার তাদের মতো ঠাসিয়া, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া চুমায় চুমায় চুষিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পারিত না, মনে হইত, বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ি হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল, বলি ওলো, আক্কেলখাগি হারামজাদি, খুব যে, ভাবিসাবির সঙ্গো মশকরা জুড়েছিস। আমার বাছার যদি কিছু হয়, তবে তোকে বুঝব আমি—হ্যাঁ।

তারপর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল, বেরো বলছি বেরো। হারামজাদির চোখ দ্যাখো দেখি।

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্বল শরীরে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। মর্মান্তিক দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া

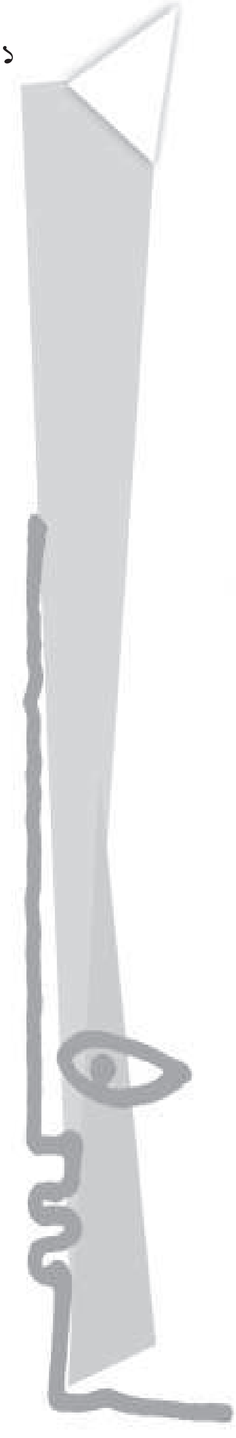

আসিয়াছিল। বারবার সে মনে মনে বলিয়াছিল— ছি ছি! তাই না কি সে পারে? ছি ছি! ভগবানকে ডাকিয়া সে বলিয়াছিল— তুমি ইহার বিচার করিবে। একশো বৎসর পরমায়ু দিয়ো তুমি সাবিত্রীর খোকাকে, দয়া করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়ো, সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালোবাসি!

কিন্তু অপরাহ্নবেলা হইতে না-হইতেই তাহার অত্যুগ্র বিষময়ী দৃষ্টিক্ষুধার কলঙ্ক অতি নিষ্ঠুরভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমনভাবে কাতরাইতেছে যে, ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের শ্মশানের জঙ্গালের মধ্যে সন্তপর্ণে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া ছিল। বারবার মুখের থুথু মাটিতে ফেলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল,— কোথায় রক্ত! গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল। প্রথম বার দুয়েক বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার পরই কুটি কুটি রক্তের ছিটা, শেষকালে একেবারে খানিকটা তাজা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছিল। সেই দিন সে নিঃশব্দে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।

গভীর রাত্রে— সে দিন বোধহয় চতুর্দশীই ছিল, হাঁ চতুর্দশীই তো— বাকুলের তারাদেবী-তলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমার আগের প্রতি চতুর্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা-তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে—মা, আমাকে ডাইনি হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন দুঃখে হতাশায় উদাস হইয়া গেল। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মতো শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাসিয়া কোন্ নিরুদ্দেশলোকে হারাইয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিঙ্গল তারার অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল। সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছাতি-ফাটার মাঠ ধুলায় ধূসর, বাতাস স্তব্ধ; ধূসর ধুলায় গাঢ় নিস্তরঙ্গ আস্তরণের মধ্যে সমস্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ওই অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলেটি এ গ্রাম হইতে খান দুই গ্রাম পার হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে। যে ঘাম সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া কে যেন বাহির করিয়া দিল। কে আবার? ওই সর্বনাশী। মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বসিয়াছে, কেন গেলাম গো—আমি ওই ডাইনির কাছে কেন গেলাম গো! আমি কী করলাম গো!

লোকে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু-কামনা করিল। একবার জন কয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঝরনাটার কাছে আসিয়াও জুটিল। বৃদ্ধা ডাইনি ক্রোধে সাপিনির মতো ফুঁসিয়া উঠিল—সে তাহার কী করিবে? সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরল লাবণ্যকোমল দেহ ধরিল কেন? অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে এক সময় চিলের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। সেই চিৎকার শুনিয়া তাহারা পলাইয়া গেল। কিন্তু সে এখনও ক্রুদ্ধা অজগরীর মতো ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদ্‌গার করিতেছে আবার নিজেই গিলিতেছে। কখনও তাহার হি-হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চিৎকারে ওই ছাতি-ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছা হইতেছে— বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া পৃথিবী ফাটাইয়া হা-হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই। এঃ, সে আজ একটা গোটা শিশুদেহের রস অদৃশ্য শোষণে পান করিয়াছে!

ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। শুক্লা নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা সাদা ফরাশের মতো পড়িয়া আছে। কোথায় একটা পাখি অশ্রান্তভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে—চোখ গেল-ল! চোখ গে-ল। আমগাছগুলির মধ্যে ঝিঁঝিপোকা ডাকিতেছে। ঘরের পিছনে ঝরনার ধারে দুইটা লোক যেন মৃদুগুঞ্জনে কথা কহিতেছে। আবার সেই ছেলেগুলা তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে না কি? অতিসন্তর্পিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা ঘরের কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না, তাহারা নয়। এ বাউরিদের সেই স্বামীপরিত্যক্তা উচ্ছলা মেয়েটা আর তাহারই প্রণয় মুগ্ধ বাউরি ছেলেটা।

মেয়েটা বলিতেছে, না, কে আবার আসবে এখুনি, আমি ঘর যাব। ছেলেটা বলিল, হেঁ! এখানে আসছে নোকে; দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে।

তা হোক। তোর বাবা যখন আমার সাথে তোর সাঙা দেবে না, তখন তোর সাথে এখানে কেন থাকব আমি?

ছি ছি ছি! কী লজ্জা গো! কোথায় যাইবে সে! যদি তাই গোপনে দুইজনে দেখা করিতে আসিয়াছে তবে মরিতে ওখানে কেন? তাহার এই বাড়িতে আসিল না কেন? তাহার মতো বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা কী? কী বলিতেছে ছেলেটা?—বাবা-মা বিয়ে না দেয়, চল তোতে আমাতে ভিন গাঁয়ে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব। তোকে নইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটির পছন্দর! ওই কুপোর মতো মেয়েটাকে উহার এত ভালো লাগিল! তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুর শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড়ো আয়নাটা। আয়নাটার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে চোদ্দো-পনেরো বছরের একটি মেয়ের ছবি। এক মাথা রুক্ষ চুল, ছোটো কপাল, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট। চোখ দুইটি ছোটো, তারা দুটি খয়রা রঙের; কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বই-কি! আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজের ছবি দেখিতেছিল। তখন আয়না তো তাহার ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে তখনও কোনোদিন দেখে নাই। আরে, তুই আবার কে রে? কোথা থেকে এলি—লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সে সবে বোলপুর আসিয়াছিল। সাবিত্রীর ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিয়া সেই চতুর্দশীর রাত্রেই গ্রাম ছাড়িয়া বোলপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লোকটাকে দেখিয়া তাহার খারাপ লাগে নাই, কিন্তু তাহার কথার ঢংটা বড়ো খারাপ লাগিয়াছিল। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, কেনে, যেথা তেকে আসি না কেনে, তোমার কী?

আমার কী? এক কিলে তোকে মাটির ভেতর বসিয়ে দেব। দেখেছিস কিল? ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ওই লোকটির দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কালো পাথরের মতো নিটোল শরীর। জিভের নীচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়াছিল। কোনো উত্তর না দিয়া তীব্র তির্যক ভঙ্গিতে লোকটার দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন সূর্য ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বদিকে চুনে-হলদে রঙের প্রকাণ্ড থালার মতো নিটোল গোল চাঁদ উঠিতেছিল; বোলপুরের একেবারে শেষে রেল-লাইনের ধারে বড়ো পুকুরটার বাঁধা ঘাটে বসিয়া আঁচল হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে সে ওই চাঁদের দিকে চাহিয়া ছিল। চাঁদের আলো তখনও দুধবরণ হইয়া উঠে নাই। ঘোলাটে আবছা আলোয় চারিদিক ঝাপসা দেখাইতেছিল। সহসা কে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। সেই লোকটা! সে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজও বেশ মনে আছে—হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে দুইটা টোল খাইয়াছিল— হাসিলে তাহার গালে টোল খাইত— সে বলিয়াছিল, কথার জবাব না দিয়ে পালিয়ে এলি যে?

সে বলিয়াছিল, এই দ্যাখো তুমি যাও বলছি, নইলে আমি চ্যাঁচাব।

চেঁচাবি? দেখছিস পুকুরের পাঁক, টুঁটি টিপে তোকে পুঁতে দেব ওই পাঁকে।

তাহার ভয় হইয়াছিল, সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, লোকটা অকস্মাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরে পা ঠুকিয়া চিৎকার করিয়া একটা ধমক দিয়া উঠিয়াছিল, ধ্যে-ৎ!

সে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল—আঁচল-ধরা হাতের মুঠিটা খসিয়া গিয়া মুড়িগুলি ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। লোকটার হি-হি করিয়া সে কী হাসি! সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিল, দুর-রো, ফ্যাচকাঁদুনে মেয়ে কোথাকার! ভাগ।

তাহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিয়াছিল, তুমি মারবা না কি?

না না, মারব কেন? তোকে শুধালাম—কোথায় বাড়ি তোর, তু একেবারে খ্যাঁক করে উঠলি। তাই বলি—

বলিয়া আবার সে হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমার বাড়ি অ্যানেক দূর, পাথরঘাটা।

কী নাম বটে তোর? কী জাত?

নাম বটে আমার 'সোরধনি', লোকে ডাকে 'সরা' বলে। আমরা ডোম বটে।

লোকটা খুব খুশি হইয়া বলিয়াছিল, আমরাও ডোম। তা ঘর থেকে পালিয়ে এলি কেন?

তাহার চোখে আবার জল আসিয়াছিল, সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল, কী বলিবে?

রাগ করে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

না।

তবে?

আমার মা-বাবা কেউ নাইকো কি না? কে খেতে পরতে দেবে? তাই খেটে খেতে এসেছি হেথাকে।

বিয়ে করিস না কেনে— বিয়ে?

সে অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহাকে—তাহার মতো ডাইনিকে—কে বিবাহ করিবে? সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তারপর হঠাৎ সে কেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা আজও অকারণে নতশিরে মাটির উপর ক্রমাগত হাত বুলাইয়া ধুলা-কাঁকর জড়ো করিতে আরম্ভ করিল। সকল কথার সূত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে,—মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হঠাৎ সূতা হইতে সূচটা পড়িয়া গেল।

আঃ, কী মশা! মৌমাছির চাক ভাঙিলে যেমন মাছিগুলা মানুষকে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই করিয়া সর্বাঙ্গ ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। কই? মেয়েটা আর ছেলেটার কথাবার্তা তো শোনা যায় না! চলিয়া গিয়াছে। সন্তর্পণে ঘরের দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া বৃদ্ধা আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল। কাল আবার উহারা নিশ্চয় আসিবে। তাহার ঘরে পাশাপাশি জায়গার মতো আর নিরিবিলি জায়গা কোথায়। এ চাকলার কেউ আসিতে সাহস করিবে না। তবে উহারা ঠিক আসিবে। ভালোবাসায় কি ভয় আছে!

অকস্মাৎ তাহার মনটা কিলবিল করিয়া উঠিল। আচ্ছা, ওই ছোঁড়াটাকে সে খাইবে? শক্ত সমর্থ জোয়ান শরীর!

সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া বারবার সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া উঠিল না না।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে আপন মনে দুলিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর উঠিয়া উঠানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়া দিল। সে বাট বহিতেছে। আজ যে সে একটা শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আজ তো ঘুমাইবার তাহার উপায় নাই। ইচ্ছা হয় এই ছাতি-ফাটার মাঠটা পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। লোকে বলে, সে গাছ চালাইতে জানে। জানিলে কিন্তু ভালো হইত। গাছের উপর বসিয়া আকাশ মেঘ চিরিয়া হু হু করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত। কিন্তু ওই মেয়েটা আর ছেলেটার কথাগুলা শোনা হইত না। উহারা ঠিক কাল আবার আসিবে।

হি হি হি! ঠিক আসিয়াছে। ছোঁড়াটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন ঘাড় ফিরাইয়া পথের দিকে চাহিতেছে। আসিবে রে, সে আসিবে!

তাহার নিজের কথাই তো বেশ মনে আছে। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় সেই জোয়ানটি ঠিক পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল। তাহার আগেই আসিয়া বসিয়া ছিল, পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আপন মনে পা দোলাইতেছিল। সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

এসেছিস? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই কথা, সে তাহাকে সেই কথাটিই বলিয়াছিল। ওঃ, ছোঁড়াটাও ঠিক সেই কথাটিই বলিতেছে ! মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; নিশ্চয় সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সে দিন সে একটা ঠোঙাতে করিয়া খাবার আনিয়াছিল। তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, কাল তোর মুড়ি পড়ে গিয়েছিল। লে।

সে কিন্তু হাত বাড়াইতে পারে নাই। তাহার বুকের দুর্দান্ত লোভ—সাপের

মতো তাহার ডাইনি মনটা বেদের বাঁশি শুনিয়া যেন কেবলই দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়াছিল, ছোবল মারিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তারপর সে কী করিয়াছিল? হাঁ, মনে আছে। সে কি আর ইহারা জানে, না, পারে? ও মাগো! ঠিকই তাই। এ ছেলেটাও যে মেয়েটার মুখে নিজ হাতে কী তুলিয়া দিতেছে। বুড়ি দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িল।

কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই হাসি তাহার থামিয়া গেল। সহসা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে স্তব্ধভাবে গাছে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল, ইহার পরই সে তাহাকে বলিয়াছিল—আমাকে বিয়ে করবি সরা?

সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। কিছু বলিতে পারে নাই, কিছু ভাবিতে পারে নাই। শুধু কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, হাত-পা ঘামিয়া টসটস করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল এই দেখ, আমি কলে কাজ করি, রোজগার করি অ্যানেক। তা জাতে পতিত বলে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি?

ঝরনার ধারে প্রণয়ী যুবকটি বলিল, এই গাঁয়ে সবাই হাঁ-হাঁ করবে—আমার জাতগুষ্টিতেও করবে, তোর জাতগুষ্টিতেও করবে! তার চেয়ে চল আমরা পালিয়ে যাই। সেইখানে দু-জনায় সাঙা করে বেশ থাকব।

মৃদুস্বরে কথা, কিন্তু এই নিস্তব্ধ স্থানটির মধ্যে কথাগুলি যেন স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। বুড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহারাও পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিল,—মাড়োয়ারিবাবুর কলের ধারে একখানা ঘর তৈয়ারি করিয়া তাহারা বাসা বাঁধিয়াছিল। 'বয়লা' না কী বলে— সেই প্রকাণ্ড পিপের মতো কলটা—সেই কলটায় সে কয়লা ঠেলিত। তাহার মজুরি ছিল সকলের চেয়ে বেশি।

ঝরনার ধারে অভিসারিকা মেয়েটির কথা ভাসিয়া আসিল—উ হবে না। আগে আমার খুঁটে দশটি টাকা তু বেঁধে দে, তবে আমি যাব। লইলে বিদেশে পয়সার অভাবে খেতে পাব না, তা হবে না।

ছি ছি, মেয়েটার মুখে ঝাঁটা মারিতে হয়। এত বড়ো একটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে, তাহার না কি খাওয়া-পরার অভাব হয় কোনোদিন! মরণ তোমার। রুপার চুড়ি কি, একদিন সোনার শাঁখা-বাঁধা উঠিবে তোমার হাতে। ছি!

ছেলেটি কথার জবাব দিল না, মেয়েটিই আবার বলিল, কী, রা কাড়িস না যে?

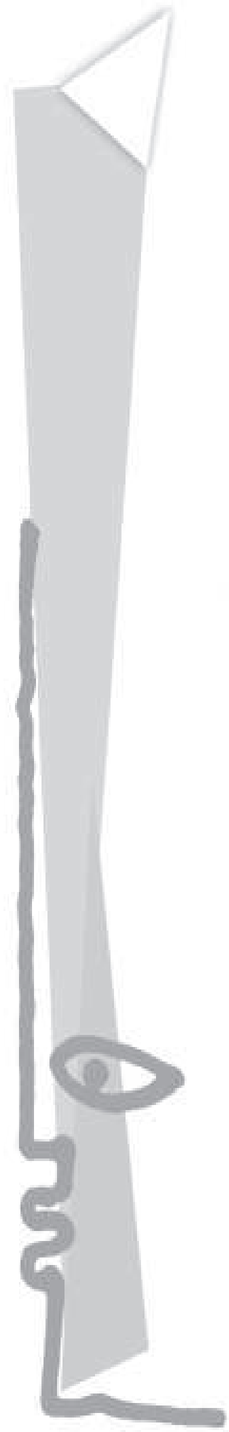

কী বলছিস বল? আমি আর দাঁড়াতে লারব কিন্তুক।

ছেলেটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কী বলব বল? টাকা থাকলে আমি তো দিতাম, রুপোর চুড়িও দিতাম, বলতে হত না তোকে।

মেয়েটা বেশ হেলিয়ে দুলিয়ে রঙ্গ করিয়াই বলিল, তবে আমি চললাম।

যা।

আর যেন ডাকিস না।

বেশ।

অল্প একটু দূরে যাইতেই সাদা-কাপড়-পরা মেয়েটি ফুটফুটে চাঁদনির মধ্যে যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। ছেলেটি চুপ করিয়া ঝরনার ধারে বসিয়া রহিল। আহা! ছেলেটার যেমন কপাল! শেষপর্যন্ত ছেলেটা যে কী করিবে—কে জানে। হয়তো বৈরাগী হইয়াই চলিয়া যাইবে, নয়তো গলায় দড়ি দিয়াই বসিবে। বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল। ইহার চেয়ে তাহার রুপার চুড়ি কয়গাছা দিলে হয় না? আর টাকা? দশ টাকা সে দিতে পারিবে না। মোটে তো তাহার এক কুড়ি টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটা টাকা, না হয় পাঁচটা সে দিতে পারে। তাহাতে কী হইবে? মেয়েটা আর বোধহয় আপত্তি করিবে না। আহা! জোয়ান বয়স, সুখের সময়, শখের সময়—আহা। ছেলেটিকে ডাকিয়া রুপার চুড়ি ও টাকা সে দিবে, আর উহার সঙ্গে নাতি-ঠাকুরমার সম্বন্ধ পাতাইবে। গোটাকতক চোখা চোখা ঠাট্টা সে যা করিবে!

মাটিতে হাতের ভর দিয়া কুঁজির মতো সে ছেলেটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে, লোকজন আসিলেও খেয়াল নাই। হাসিয়া সে ডাকিল, বলি, ওহে লাগর, শুনছ?

দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথার সাড়ায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিল। পর-মুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্তে বৃদ্ধারও একটা অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল; ক্রুদ্ধা মার্জারীর মতো ফুলিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল, মর মর—তুই মর। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল, ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।

ছেলেটা একটা আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। পর-মুহূর্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পালাইয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্বনাশী

ডাইনি বাউরিদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে, ছেলেটা সন্ধ্যায় গিয়াছিল ওই ঝরনার ধারে; মানুষের দেহরসলোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্টা বাঘিনির মতো জানিতে পারিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরা মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেই সে কী রক্তপাত! তাহার পরই প্রবল জ্বর; আর কে যেন তাহার মাথা ও পায়ে চাপ দিয়া তাহার দেহখানি ধনুকের মতো বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে!

কিন্তু সে তাহার কী করিবে?

কেন সে পলাইতে গেল? পলাইয়া যাইবে? তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইবে? সেই তাহার মতো শক্তিমান পুরুষ—যে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিত—শেষপর্যন্ত তাহারই অবস্থা হইয়া গিয়াছিল মাংসশূন্য একখানি মাছের কাঁটার মতো।

কে এক গুনিন না কি আসিয়াছে। বলিয়াছে এই ছেলেটাকে ভালো করিয়া দিবে। তিলে তিলে শুকাইয়া ফ্যাকাশে হইয়া সে মরিয়াছিল। রোগে-ঘুসঘুসে জ্বর কাশি। তবে রক্তবমি করিয়াছিল কেন সে?

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে উন্মত্ত অস্থিরতায় অধীর হইয়া বৃদ্ধা আপনার উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে ছাতি-ফাটার মাঠ আগুনে পুড়িতেছে নিস্পন্দ শবদেহের মতো। সমস্ত মাঠটার মধ্যে আর কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা নাই। বাতাস পর্যন্ত স্থির হইয়া আছে।

যাহাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসিত, কোনোদিন যাহার উপর এতটুকু রাগ করে নাই, সেও তাহার দৃষ্টিতে শুকাইয়া নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আক্রোশ, নিষ্ঠুর শোষণ হইতে বাঁচাইবে ওই গুনিনটা!

হি-হি করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে সে হাসিয়া উঠিল। উঃ, কী ভীষণ হাঁপ ধরিতেছে তাহার। দম যেন বন্ধ হইয়া গেল। কী যন্ত্রণা, উঃ—যন্ত্রণায় বুক ফাটাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। ওই গুনিনটা বোধহয় তাহাকে মন্ত্রপ্রহারে জর্জর করিবার চেষ্টা করিতেছে। কর, তোর যথাসাধ্য তুই কর!

এখান হইতে কিন্তু পলাইতে হইবে। তাহার মৃত্যুর পর বোলপুরের লোকে যখন তাহার গোপন কথাটা জানিতে পারিয়াছিল, তখন কী দুর্দশাই না তাহার করিয়াছিল। সে নিজেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। কলের সেই হাড়িদের শংকরীর সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার কাছেই সে একদিন মনের আক্ষেপে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার পর সে গ্রামের বাহিরে এক ধারে লোকের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া বাস করিতেছে। কত জায়গাই যে সে ফিরিল। আবার যে কোথায় যাইবে।

ও কী! অকস্মাৎ উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি উচ্চ কান্নার রোল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়া পাগলের মতো ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিল। সন্ধ্যার মুখে সে একটি ছোটো পুঁটলি লইয়া ওই ছাতি-ফাটার মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল। পলাইবে—সে পলাইবে।

একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সমস্ত নিথর, নিস্তব্ধ। তাহারই মধ্যে পায়ে পায়ে ধুলা উড়াইয়া বৃদ্ধা ডাইনি পলাইয়া যাইতেছিল। কতক দূর আসিয়া সে বসিল, চলিবার শক্তি যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, ওগো, তুমি ফিরে এসো গো!

উঃ, তাহার নরুন-দিয়া চেরা ছুরির মতো চোখের সম্মুখে আকাশের বায়ুকোণটা তাহার চোখের তারার মতোই খয়ের রঙের হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পায়ের ধুলার আস্তরণের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কালবৈশাখীর ঝড় নামিয়া আসিল। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! দুর্দান্ত ঘূর্ণিঝড়। সঙ্গে মাত্র দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি।

পরদিন সকালে ছাতি-ফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরি গুল্মের একটা ভাঙা ডালের সূচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশ-পথে যাইতে যাইতে ওই গুনিনের মন্ত্রপ্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখির মতো পড়িয়া ওই গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নীচে ছাতি-ফাটার মাঠের খানিকটা ধুলা কালো কাদার মতো ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে; ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে!

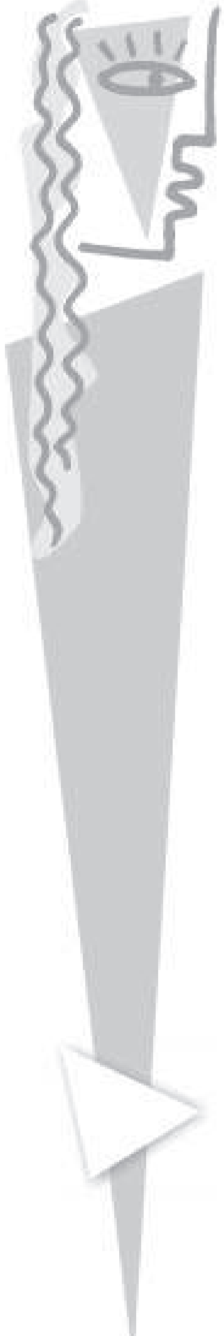

অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকের দিকচক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমাণ বিন্দু ক্রমশ আকারে বড়ো হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।

ঘূর্ণমান পৃথিবী

আশাপূর্ণা দেবী

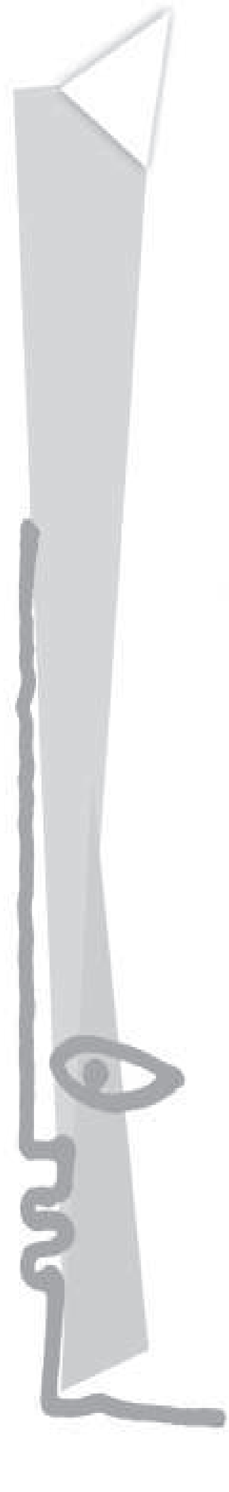

গতকাল থেকেই অনুভব করছেন শিবনাথ ওদের মধ্যে কীসের যেন একটা আয়োজন চলছে। 'ওদের' মানে শিবনাথের ছেলে আর বউ—শঙ্খনাথ, আর রুচিরার মধ্যে। মনে হচ্ছে রুচিরা শঙ্খনাথকে দু-দিন ছুটি নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে, শঙ্খ রাজি হচ্ছে না, বলছে এখন অফিসে কাজের ভিড়, এমনিতেই তো দু-দিন ছুটি পাওয়া যাচ্ছে, ওতেই হবে।

নিজে থেকে কিছু জিগ্যেস করতে আজকাল কেমন বাধে শিবনাথের। আগে সব কিছু ব্যাপারেই মহোৎসাহে জিগ্যেস করতেন, কিরে শঙ্খ, কী কথা হচ্ছে রে? কিন্তু ক্রমশই যেন টের পাচ্ছেন, শিবনাথের এই অকারণ কৌতূহল ওরা তেমন প্রীতির চক্ষে দেখছে না।

ছেলে আর বউ।

এদের শিবনাথ, 'ওরা' ছাড়া আর কিছু ভাবেন না, ওদের বিষয়ে কিছু ভাবতে গেলে একত্রে 'ওদের' বলেই ভাবেন। তার কারণ আলাদা করে শঙ্খর যেন কোনো সত্তা খুঁজে পান না আর।

শৈশবে মাতৃহারা 'শঙ্খ' নামের যে ছেলেটাকে শিবনাথ আটাশ বছর ধরে চিনে এসেছেন, জেনে এসেছেন তার ইচ্ছে, পছন্দ, রুচি, মনোভাব, মতবাদ, সেই ছেলেটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। একটা সত্তাই শুধু চোখে পড়ে, সে হচ্ছে 'রুচিরা' নামের একটি সুন্দরী সুশিক্ষিতা মধুভাষিণী মেয়ে।

ওকে যেন কেমন ভয় ভয় করে শিবনাথের, অথবা সমীহ সমীহ। ওর আড়াল থেকে শঙ্খকে ঠিক দেখতে পান না। অতএব শিবনাথ দুজনকে এক করে ভাবেন।

ভাবেন—থাকগে, ডেকে ডেকে জিগ্যেস করাটা ওরা যখন পছন্দ করে না!

কিন্তু ওরা তো অবিবেচক নয়, যে যা করবে বাপকে জানাবে না। সকালবেলা চায়ের টেবিলে একথা সেকথার মধ্যে জানিয়ে দিল, পরপর দুদিন ছুটির সুযোগে ওরা বর্ধমান যাচ্ছে। আর যাচ্ছে নতুন কেনা গাড়িটা করে।

বর্ধমানটা অবশ্যই বেড়াতে যাবার পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় জায়গা নয়, কিন্তু বর্ধমানে রুচিরার দিদির বাড়ি, অতএব পরম আকর্ষণীয়।

কথাটা শুনেই শিবনাথ ফস করে একটা বোকার মতো কথা বলে হাসেন। বলেন, গাড়িতে যাবে? তেল তো অনেক খরচা হবে।

বলেই মনে হল কথাটা বোকার মতো হল। তেল পোড়াবার জন্যেই তো গাড়ি কেনা। কিন্তু বলে যখন ফেলেছেন একটা অদৃশ্য হাসি দেখতেই হবে। মাঝে মাঝে ওই অদৃশ্য হাসি দেখতে হয় শিবনাথকে শঙ্খ হঠাৎ বড়োলোক হয়ে যাওয়া থেকে। ...হ্যাঁ হঠাৎই বড়োলোক হয়ে গেছে সরকারি অফিসের ভূতপূর্ব কেরানি শিবনাথের ছেলে শঙ্খনাথ।

কিন্তু শিবনাথ যেন সেটা এখনো অনুভবে পাচ্ছেন না। শিবনাথের যেন মনে হয় এ একটা অলীক কথা।

শিবনাথের ছেলে একখানা অ্যামবাসাডার গাড়ি কিনে ফেলেছে, যত ইচ্ছে তেল পুড়িয়ে পুড়িয়ে বেড়াতে যাচ্ছে, এটা স্বপ্ন না মায়া কে জানে। শুধু গাড়ি কেনাই নয়, চালাতেও শিখে ফেলেছে, শুধু শঙ্খই নয়, তার বউও, সবই যেন অবাস্তব। তাই হঠাৎ হঠাৎ এক একটা বোকার মতো কথা বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।

অবশ্য ছেলে-বউ শিবনাথের কর্তব্য বুদ্ধিহীন নয়, চক্ষু-লজ্জাহীনও নয়। গাড়ি কিনেই প্রথমদিনই বাবাকে নিয়ে কালীঘাটে পুজো দিইয়ে এসেছে, এবং প্রথম রবিবারেই বাবাকে দক্ষিণেশ্বরে ঘুরিয়ে এনেছে। সে দিন শিবনাথের সুখে আনন্দে দুঃখের নিশ্বাস পড়েছে, শঙ্খর বহুদিন আগে মৃত মায়ের জন্যে।

কিন্তু সেই মৃত্যুটা এত পুরোনোকালের আর শঙ্খর কাছে এতই ঝাপসা যে সেই নিয়ে তার সামনে আক্ষেপ করাটা হাস্যকর। শিবনাথ তো আর সেই পরলোকগতাকে ছেলের মনে চিরজাগরূক করে রাখবার জন্যে বৈজ্ঞানিকসম্মত কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করেননি।

শিবনাথ ছেলেকে 'মানুষ' করে তোলবার জন্যে আপ্রাণ করেছেন, শিবনাথের চেষ্টা সফল হয়েছে, মানুষ হয়েছে ছেলে। আশাতীত হয়েছে। শিবনাথ কি কোনো দিন আশা করেছিলেন এতটা হবে। শিবনাথ ওর বাড়বাড়ন্ত গতি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছেন এবং 'ওদের' অবাধ গতিবিধি দেখে কখনও বিস্মিত, কখনও ঈর্ষিত

আর কখনও বিরক্ত হচ্ছেন।

তবু আবার সে বিরক্তির, ঈর্ষা আর বিস্ময়ের বস্তুগুলো নিয়ে লোকের কাছে গর্ব করতেও ছাড়েন না শিবনাথ। ছেলে গাড়ি কেনামাত্রই ওঁর 'অবসারিকা' ক্লাবের বন্ধুদের কাছে খবরটি পরিবেশন করেছেন। যদিও অন্য ছলে! বলেছেন যেন কথায় কথায়, এই চারদিকে শুনি পেট্রোলের দাম এত বেড়েছে, তাতো বেড়েছে, লোকে গাড়ি রাখতে পারছে না বেচে দিচ্ছে, আর এখন কি না আমার শঙ্খবাবু দুম্ করে একখানা অ্যামবাসাডার কিনে বসলেন।

এই রকমই বলেন, যেন নিন্দাছলেই ছেলের বাড়বাড়ন্তর কথাগুলো শুনিয়ে দিয়ে আসেন, বন্ধুদের।

আজও বর্ধমানে যাওয়ার খবরটা পাওয়া মাত্রই একটা বোকামি করে ফেলেও বাজারে পরিচিতজন সকলকে ধরে ধরে শুনিয়ে দিলেন, শুনেছ কাণ্ড। নতুন গাড়িতে বাবা আমার আজ বর্ধমানে চললেন শালির বাড়ি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ট্রেন রয়েছে বর্ধমানের, অকারণ কতটা তেল পোড়ানো, ভাবো।

কেউ বলেছে, এখনকার ছেলে-পুলেদের তো ওই, যা রোজগার করবে, দু-হাতে ওড়াবে। কেউ বা বলেছে, ভগবানের আশীর্বাদ। কৃতী হয়েছে। তদুপযুক্ত চলবে বই-কি।

শিবনাথের মনে হয়েছে, কেউই যেন ঠিক প্রাণ থেকে কথাগুলো বলল না। যেন শিবনাথের ছেলে শঙ্খ যে এইবার সেই একখানা গাড়ি কিনে ফেলেছে, এটা যেন একটা খবরের মতো খবরই নয়। শিবনাথ বললেন, তাই শুকনো শুকনো জবাব দিল।

তারপরেই কিন্তু হঠাৎ একটা ইচ্ছে মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। বর্ধমানে যাচ্ছে ওরা। তার মানে কুতুলপুরের ওপর দিয়েই। তার মানে টুনির বাড়ির কাছ দিয়ে।

ট্রেন নয় যে সামনে দিয়ে চলে গেলেও অমোঘ নিয়মে চলেই যাবে, থামতে বললে থামবে না। এ বাবা নিজের ইচ্ছেয় থামা চলা, আর সেই থামা চলাটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শিবনাথের নিজের ছেলের হাতে।

সে বাড়ি শঙ্খ চেনে না, কিন্তু শিবনাথ তো চেনেন? অবিশ্যি বহুকাল যাননি, তবু ভুলে যাননি। আর যদিই বা ভুলে যান। বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তীর বাড়ি বললে সবাই দেখিয়ে দেবে। নামকরা লোক ছিলেন টুনুর শ্বশুর।

গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করে নিয়েই চট করে বলে ফেলা

যাবে, এই তো। শঙ্খ এখানেই থামা। এখন আর তোদের নামতে হবে না, যাচ্ছিস এক জায়গায়, ফেরার সময় আমায় তুলে নিয়ে যেতে তো নামতেই হবে, তখন দেখা করে যাস পিসির সঙ্গে।

শঙ্খ বিবেচক ছেলে, শিবনাথও কিছু অবিবেক বাপ নয়। অন্য বাপ হলে হয়তো বলতো, সে কী কথা, একবার নামবি না? পিসিকে একটা পেন্নাম করে যাবি না? পিসি বলবে কী? কিন্তু শিবনাথ বোঝেন, যাবার পথে বাধাবন্ধ না করাই ভালো।

টুনুর বাড়ি যাবার কথা চিন্তা করতেই ভারী মন কেমন করে ওঠে বিধবা ছোটো বোনটার জন্যে। আহা বেচারি চিরদিন গরিব। স্বামী থাকতেও যা, এখনো তাই। স্বামী তো ছিল, অপদার্থ।— এই তো কলকাতা থেকে কতই বা দূরে, সাতজন্মে একবার আসতে পারে না, কেউ আনেও না। কেইবা আনবে? শিবনাথের স্ত্রী। বেচারি টুনির বউদিটি মারা যাওয়ার পর থেকে ভাইয়ের বাড়ি আসা ফুরিয়েছে টুনুর। শিবনাথ যেতেন মাঝে মাঝে এটা ওটা নিয়ে। রিটায়ার করার পর সেও বন্ধ হয়ে গেছে। তিন সাড়ে তিন বছর দেখেননি বোনটাকে।

তাই ঠিক! শিবনাথ আজ এদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, ওই পথ দিয়েই তো যাবি, যাবার সময় আমায় তোদের পিসির বাড়ি নামিয়ে দিয়ে যা, পরশু ফেরার সময় ফের তুলে নিয়ে যাবি।

তারপর হেসে হেসে বললেন, তেল পোড়ানো নিয়ে তোকে বলছিলাম, দেখ এখন আবার কেমন সুবিধেটি এঁটে নিলাম। যাক আরও খানিকটা উশুল হবে।

যতই ভাবতে থাকেন, ভারী একটা পুলক অনুভব করেন শিবনাথ। ভাবতে থাকেন টুনি হঠাৎ দাদাকে দেখে কী পরিমাণ খুশি হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললেন, এবারে পেনশনের টাকাটা থেকে বেশ খানিকটা নিয়ে যাবেন টুনির জন্য। মাসে মাসে নাম রক্ষার্থে যে পঁচিশটি টাকা মানি অর্ডার করেন টুনির নামে, সেটা এবার দেওয়া হয়নি, তার সঙ্গেই আর গোটা পঞ্চাশ দিয়ে দেবেন ছেলেপুলেরা মিষ্টি খাবে বলে।

পেনশনের টাকাটা তো আজকাল জমেই যাচ্ছে, শঙ্খ আর নিতে চায় না আজকাল, শিবনাথও ওদের এই সমারোহের সংসারে সেই অকিঞ্চিৎকরটুকু দিতে চাইতে লজ্জাবোধ করেন। একদা যে ওইটির প্রত্যাশায় তারিখের দিকে দৃষ্টি হেনে বসে থাকতে হত। সেকথা এখন আর কারুরই মনে পড়ে না।

যাবেন ঠিক করে ফরসা ধুতি পাঞ্জাবি বার করে রাখলেন, রাখলেন টাকাটা,

কিন্তু ঝপ করে বলে ফেলতে পারছেন না, তোদের সঙ্গে আমিও চলছিরে... !

আসলে ভাষাটা ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না, বারবার মুসাবিদা করছেন, কিন্তু ডেকে কথা বলার অনভ্যাসেই বোধহয় কোনো মুসাবিদাই কার্যকরী হয়ে উঠছে না। ওরা সামনে দিয়ে ঘুরছে ফিরছে বেরুচ্ছে ঢুকছে, শিবনাথ মাঝে মাঝে কেশে নিচ্ছেন। অবশেষে বলেই ফেললেন।

বললেন যেন খাপছাড়া ভাবে, বলে উঠলেন, তোমরা বেরোচ্ছো কখন?

উভয়কে সম্বোধন করার অভ্যাসে ছেলেকে 'তুই' করে কথা বলাটা প্রায় ভুলেই গেছেন শিবনাথ। ... ছেলে যখন একা থাকে?

নাঃ তেমন সুবর্ণ সুযোগ জোটে না শিবনাথের। ছেলেকে 'একা' দেখার সৌভাগ্য এক মিনিটের জন্যও কই হয় না।

শঙ্খ জানে, অনাবশ্যক প্রশ্ন রুচিরা পছন্দ করে না। তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, এই তো খাওয়ার পরই, দুটো-আড়াইটে নাগাদ।

শিবনাথ বলেন, তাই ভালো, শীতের দিনে দুপুরে দুপুরে গেলেই ভালো।

শঙ্খ রুচিরার মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে ফেলে, হ্যাঁ সেই জন্যেই তো—।

ও বেচারার জ্বালা কম নয়, বাবার সব কথাই এমন বোকার মতো। রুচিরার বাবার সঙ্গে তুলনা করলে মাথা কাটা যায়।

ওদিকে শিবনাথ যাকে বলে ফাঁড়া খন্ডে যাক নীতিতে ঝুলে পড়েন, ভাবছি, আমিও তোমাদের সঙ্গে গাড়িতে চলে যাই।

গাড়িতে চলে যাই!

তোমাদের সঙ্গে!

কথাটা বাংলা ভাষা? না অন্য কিছু?

ধাক্কাটা সামলে শঙ্খ বলে আপনি? মানে আপনি বর্ধমানে—

শিবনাথ অপ্রতিভ হতে হতে অকারণে খানিকটা জোরে হেসে নিয়ে বলেন, দিয়েছি তো চমকে? আরে বাবা বর্ধমানে তোমাদের ওখানে কি আর? কুতুলপুরের ওপর দিয়েই তো যেতে হবে? আমায় তোমরা টুনুর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে। ফেরার সময় আবার আমায় পিক আপ করে নেবে। কতকাল দেখিনি। কবে আছি কবে নেই। তাছাড়া লোকমুখে ভাইপোর বোলবোলাও শুনছে টুনছে তো, গাড়ি কিনেছে দেখলে আহ্লাদে মরেই যাবে চিরকেলে পাগলি তো।

এতক্ষণে রুচিরা কথা বলে।

বেশ শান্তভাবেই বলে, সে তো বোঝাই যায়। কিন্তু খামোকা পিসিটিকে মেরে

ফেলাই কি ভাইপোর উচিত হবে?

শিবনাথের জিভটা শুকিয়ে ওঠে, তবু শিবনাথ মিথ্যে খানিকটা হেসে বলেন, আহা সত্যি কি আর মরবে? অধিকটা বোঝাতেই লোকে 'মরা' কথাটা বলে তো? যাক আমিও তাহলে ঠিকঠাক হয়ে নেব।

শঙ্খ আস্তে পাশের মুখটার দিকে তাকায়, শঙ্খর মুখটা সাদাটে দেখায়, তবু শঙ্খ গম্ভীরভাবে বলে, ঠিক আছে।

যাক বাবা! ভয়ের ঘাটটা পার হয়ে যাওয়া গেছে। শিবনাথ জানেন না ভয়টা কীসের। তবু শিবনাথের কথা বলতে ভয় ভয় করে।

এখন ফাঁড়া কেটে গেছে, এখন শিবনাথ ভাবতে থাকেন, দাদাকে হঠাৎ দেখে টুনি কী বলবে, কী করবে, কী খাওয়াতে বসবে, এবং শিবনাথ তার জবাবে কী করবেন, কী বলবেন! নাঃ সত্যি গাড়ি একটা থাকা রীতিমতো সুখের।

বলি বটে বাবুয়ানা, কিন্তু ঠিক তা নয়, গাড়ি যেন একটা মুক্তির দূত।

ওদের আগেই খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটু বিশ্রাম করে নেওয়া ভালো, যতই হোক অনেকখানি জার্নি।... কিন্তু বিশ্রাম কোথায়? দু-মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখলে কি আর বিশ্রাম হয়?

তাইতো করছেন শিবনাথ, অবিশ্রাম ঘড়িই দেখছেন বিশ্রামের বদলে।

কিন্তু কী হল?

ওদের আর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? খেয়ে উঠে ঘুমিয়ে পড়ল না কি? শীতের দুপুরে, খেয়ে উঠে শুয়ে কি আর সহজে উঠতে পারবে? বেলা গড়িয়ে যাবে। নাই হোক ট্রেনের সময়। সময় একটু থাকা ভালো।

আবার ঘড়ি দেখেন।

আড়াইটা ছাড়িয়ে তিনটে বেজে গেল যে!

আর পারলেন না শিবনাথ, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন গুটি গুটি, আস্তে ডাকেন শঙ্খ! প্রথমটা আস্তে ডাকাই ভালো, হঠাৎ জোরে ডাক শুনে জেগে উঠলে ক্ষতি হবে।

কিন্তু না, ঘুমোচ্ছে না শঙ্খ।

ডাকা মাত্রই বেরিয়ে আসে সে।

শিবনাথ বললেন, কী হল? তিনটেও বেজে গেল যে, কখন বেরোবে?

এই একবার একা পেলেন ছেলেকে, তাই হেসে বললেন, খেয়ে শুয়ে পড়েছিলি তো?

শঙ্খ বলল, বেরোনো তো হচ্ছে না।

শঙ্খর গলা নির্লিপ্ত নিথর।

শিবনাথ থতোমতো খেয়ে বলেন, বেরোনো হচ্ছে না!

শঙ্খ তেমনি পাথুরে গলায় বলে, না! হঠাৎ দারুণ মাথা ধরে গেছে ওর, যাওয়া সম্ভব হবে না।

দারুণ মাথাধরা!

রুচিরার!

না, তাহলে আর যাওয়ার কথা উঠতে পারে না।

তবু নির্বোধ শিবনাথ বলে ফেলেন, ছুটির একটা দিন তো তাহলে গেল।

শঙ্খ একটু হাসির মতো করে বলে, একদিন কেন দু-দিনই গেল। একদিনের জন্যে যাওয়ার তা কোনো মানে হয় না।

তাইতো বটে! যার কোনো মানেই হয় না, তাই নিয়ে আর ভাবতে বসবেন না কি শিবনাথ? বরং অন্য অনেক জরুরি ব্যাপারে নিয়ে ভাবুন বসে বসে।

কিন্তু শিবনাথ যেন ভাবতেও ভুলে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে, নচেৎ শঙ্খ তো কথা অন্তেই আবার তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেছে, বোধ করি রোগিণীর সেবা করতেই, পর্দাটা এখনো দুলছে।

কিন্তু দুলন্ত পর্দা এমন একটা কী দৃশ্য যে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে?

না কি শিবনাথের চোখের সামনে আরও কিছু দুলছে?...ওই দরজা জানালা দেওয়াল ছাদ সংসার পৃথিবী! তাই ভাবতে পারছেন না কিছু?

না কি ভাবছেন, এরপর যদি কোনোদিন শঙ্খনাথ নামক ব্যক্তিটির গাড়িতে চড়তে না যায় শিবনাথ নামের লোকটা তাহলে তো ওই লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা হিংসুটে লোকটারই নিন্দে হবে।

হবে না নিন্দে?

যে লোক ছেলের বাড়বৃদ্ধিতে হিংসে করে এমন কুচুটেপানা করে তার কি নিন্দে না হয়ে প্রশংসা হবে?

অতএব লোকটাকে—

না, এখনও আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না।

পর্দাটা থেমে গেছে, তবু পৃথিবীটার দুলুনি থামছে না।

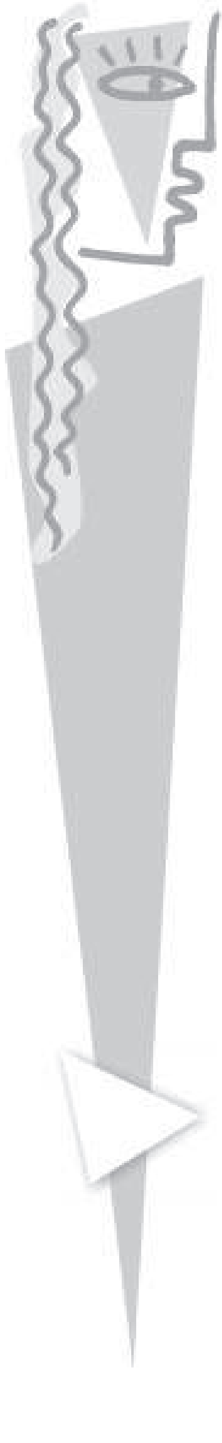

হেডমাস্টার

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

টাইপ করা কতগুলি জরুরি চিঠিপত্রে নাম স্বাক্ষর করছিলাম। টাইপিস্ট পরেশবাবু নিজে এসে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আজই চিঠিগুলি ডাকে পাঠাতে হবে। সই করতে করতে একটু ধমকও দিলাম পরেশবাবুকে, 'একেবারে ছুটির সময় নিয়ে এলেন, এক্ষুণি উঠব ভাবছিলাম।'

পরেশবাবু বোধহয় তাঁর সহকারীর ঘাড়ে দোষটা চাপাতে যাচ্ছিলেন, বেয়ারা নিতাই এসে সামনে দাঁড়াল।

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোমার আবার কী।'

নিতাই বলল, 'আরও একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্লিপ দিয়েছেন।'

একবার তাকিয়ে দেখলাম, অফিসেরই ছোট্ট ভিজিটিং স্লিপ। পেনসিলে লেখা দর্শনপ্রার্থীর নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার। দেখা করতে চান নিরুপম নন্দীর সঙ্গে। উদ্দেশ্যটা উহ্য। হয়তো গুহ্য বলেই। নাম দেখে কারো মুখ মনে পড়ল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করে বেয়ারাকে বললাম, 'বল বসতে হবে। ব্যস্ত আছি।' চিঠিগুলিতে নাম স্বাক্ষর শেষ করতে না করতে ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বেয়ারা শীতল আর এক গাদা চেক এনে হাজির করল। চেকগুলির উলটো পিঠে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট্যান্টের সই চাই।

চটে উঠে বললাম, 'নিয়ে যাও। এখন সই হবে না।'

বেয়ারা চেকগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ক্লিয়ারিং-এর ইনচার্জ পরিমলবাবু নিজেই সেগুলিকে ফের বয়ে নিয়ে এলেন, 'সব ঠিক করে রেখেছি। শুধু আপনার সইটাই বাকি। কাল শনিবার। এসেই তাড়াতাড়ি হাউসে পাঠাতে হবে।'

বললাম, 'তা জানি, একটু আগে পাঠালেই পারতেন। এর পর থেকে কোনো কাগজপত্রে দুটোর পর আমি আর সই করব না।'

পরিমলবাবু মুখ কালো করে বললেন, 'অমনিতেই আমার ডিপার্টমেন্টে একজন লোক শর্ট আছে। তারপর বিনয়বাবু আজ আসেননি। সব ঠিকঠাক করে আনতে দেরি হয়ে গেল। এখন শুধু আপনার সইটা হলেই হয়ে যায়।

শুধু সই, ভাবখানা এই, আমরা এত পরিশ্রম করছি, আর আপনি শুধু সইটা করতে পারবেন না! সংক্ষেপে কেবল নিজের নামটুকু স্বাক্ষর করতে এত কষ্ট বোধ করছেন আপনি। কিন্তু সই করাটা যে সব সময় সহজ এবং প্রীতিপদ নয় সে ধারণা এদের নেই।

মনে পড়ল ছেলেবেলায় নাম স্বাক্ষর করতে শিখে যেখানে-সেখানে দেয়ালে, কপাটে, বাবার নতুন পঞ্জিকায়, পুরোনো দলিলে, নিরুপম নন্দীকে অমর করে রাখবার কি চেষ্টাই না করেছি। কিন্তু ঠেকে ঠেকে এখন শিক্ষা হয়ে গেছে। যত্রতত্র নাম স্বাক্ষর করতে আজকাল সহজে স্বীকৃত হই না। অনেক কুণ্ঠা, অনেক কার্পণ্য প্রকাশ করি। তা সত্ত্বেও অফিসের রাশি রাশি কাগজপত্র নিত্যই যখন নাম স্বাক্ষর করতে হয়, তখন তার নামটাকে নিজের বলে মনে হয় না, এমনকি অক্ষর পরিচয়ের ওপর ঘৃণা জন্মে যায়।

স্বাক্ষর পর্ব শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ টেবিলের ওপর সেই চিরকুটটি চোখে পড়ল। কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার। জ্বালাতন করে ছাড়ল। বেয়ারাকে ডেকে বললাম, 'কে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন বাইরে। আসতে বল।'

একটু পরেই ভদ্রলোক আমার চেম্বারের কাটা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'একি মাস্টারমশাই, আপনি।'

আমাদের সাগরপুর এম ই স্কুলের হেডমাস্টার।

মাস্টারমশাই ততক্ষণ আমার সামনের চেয়ারটায় বসে বললেন, 'বসো, কয়েকদিন ধরেই আসব আসব ভেবেছিলাম। শেষপর্যন্ত এসে পড়লাম।'

ছেলেবেলার শিক্ষক। জোড় হাতে নমস্কার চলে না। পায়ে হাতে প্রণামই বিধেয়। কিন্তু ইউরোপীয় পোশাকে প্রণামের প্রাচ্য পদ্ধতির অনুসরণ অশোভন না হোক, অসুবিধাজনক। তবু একটু ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত উঠে দাঁড়ালাম। তারপর এগিয়ে এসে নীচু হয়ে মাস্টারমশারই পামশু ঢাকা পায়ে দুটো আঙুল ছোঁয়ালাম! আঙুলে অবশ্য ধুলো লাগল না কিন্তু মনে হল নতুন কেনা টাইয়ের আগাটা মেঝের ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেছে।

সত্যিই পায়ের ধুলো নিই কি না দেখবার জন্য মাস্টারমশাইও এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। এবার নিঃসংশয় হয়ে হাত ধরে বসিয়ে বললেন, 'থাক

থাক, সিটে বস গিয়ে। ভালো তো সব?' নিশ্চিন্ত হয়ে আত্মপ্রসাদে এবার একটু হাসলেন। মাস্টারমশাই। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম সামনের দুটো দাঁত মাস্টারমশাইর পড়ে গেছে। মনে পড়ল দাঁতের ওপর ভারী যত্ন ছিল মাস্টারমশাইর। নিমের ডাল ভেঙে রোজ সকালে দাঁত মাজতেন। লবঙ্গ, হরিতকি ছাড়া কোনোদিন পান খেতে তাঁকে দেখিনি। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দাঁতের অধ্যায়টা একেবারে লাইন বাই লাইন মেনে চলতেন মাস্টারমশাই। তবু দন্তপঙ্‌ক্তিতে ভাঙন ধরেছে।

ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে বললাম, 'দুটো দাঁত পড়ে গেছে দেখছি।'

মাস্টারমশাই ইংরেজিতে স্বীকৃতি জানালেন, 'Yes, I have lost two of them. কিন্তু আরগুলো সব শক্ত আছে।'

শেষ কথাটায় মাস্টারমশাইর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠল। মৃদু হেসে বললাম, 'তারপর স্কুলের খবর কী বলুন। কেমন চলছে?'

মাস্টারমশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'স্কুল? তুমি কি দেশগাঁয়ের কোনো খবরই রাখ না না কি?'

অপরাধীর ভঙ্গিতে বললাম, 'না শিগগির কোনো খবরটবর—'

মাস্টারমশাই সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে বললেন, 'স্কুল আমি ছেড়ে দিয়েছি।' বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সেকি স্যার, আপনি স্কুল ছাড়লেন?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'হ্যাঁ ছেড়ে এসেছি। এসেছি যখন সবই বলব, সবই শুনবে। তার আগে যে জন্য আসা। একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করে দাও নিরুপম। তোমাদের অফিসে আছে না কি খালিটালি কোনো জায়গা?'

'আমাদের অফিসে?' মাস্টারমশাইর মুখের দিকে আমি একটুকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি কি পরিহাস করছেন? কিন্তু পরিহাসের সম্পর্কে তো নয়। তা ছাড়া ঠাট্টা-পরিহাসের মতো মুখের ভাবও তাঁর এখন নেই। দাঁতগুলো শক্ত থাকা সত্ত্বেও গাল দুটো ভাঙা ভাঙা, চোয়াল জেগে উঠেছে। গভীর রেখা পড়েছে কপালে। কালো লম্বাটে মুখখানায় কেমন এক ধরনের করুণ শীর্ণতা। মাথায় চুল ছোটো করে ছাঁটা, কিন্তু কালোর চেয়ে সাদা রঙের ভাঁজই চুলে বেশি। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলাম। হেডমাস্টারমশাইও বুড়ো হয়েছেন। তাঁর যুবক বয়সের কিশোর ছাত্র ছিলাম আমরা। মাস্টারমশাইর বার্ধক্যে নিজের বয়োবৃদ্ধি সম্বন্ধে যেন নতুন করে সচেতন হয়ে উঠলাম।

কিন্তু একী বলছেন মাস্টারমশাই। পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে বয়স। এই বয়সে

তিনি নতুন করে চাকরিতে ঢুকবেন। মাথা কি ওঁর—। মাস্টারমশাইর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, 'স্কুল ছেড়ে এলেন কেন?'

মাস্টারমশাই রূঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ছেড়ে এলাম কেন? ছাড়ব না কি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরব? তাই বল তোমরা!'

বেয়ারা একবার দোর ঠেলে উঁকি দিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো বাজে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলুন মাস্টারমশাই বেরুনো যাক। যেতে যেতে সব শুনব।'

ডালহৌসি স্কোয়ারের মোড় থেকে দক্ষিণ কলকাতাগামী ট্রাম ধরলাম। তারপর মাস্টারমশাইর পাশাপাশি বসে শুনতে লাগলাম সাগরপুর এম ই স্কুল আর তাঁর ইদানীংকার ইতিহাস।

পাকিস্তানে হুজুগে গাঁয়ের বেশিরভাগ হিন্দু ছাত্র চলে আসায় স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় দশ আনি কমে গেছে। বাকি ছয় আনির মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছাত্রের কাছ থেকে নিয়মিত মাইনে আদায় হয় না। একমাত্র সরকারি সাহায্য পঞ্চাশ টাকা ভরসা। এম ই স্কুলের পাঁচজন মাস্টারের মধ্যে সেটা বাঁটোয়ারা হয়। সাহায্য বৃদ্ধির জন্য জেলা শহরে গিয়ে ধরাধরি করেছেন হেডমাস্টারমশাই, কিন্তু ইনস্পেক্টর এসে স্কুল পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিয়েছেন স্কুলের যা ছাত্রসংখ্যা তাতে পঞ্চাশের চাইতে বেশি সাহায্য সাগরপুর এম ই স্কুল আশা করতে পারে না। চার মাইল দূরে হোসেনপুরের নতুন এম ই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা সাগরপুরের দেড়া, অথচ সে স্কুলের বরাদ্দ পঞ্চাশের চাইতে এখনও পাঁচ টাকা কম আছে।

কিন্তু এতেও হেডমাস্টারমশাই ঘাবড়াননি। টুকটাক করে চালিয়ে নিচ্ছিলেন সংসার। সবচেয়ে বড়ো ভরসা ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারি নিত্যনারায়ণ চৌধুরী। চৌধুরী বাড়ির টিউশনিও গোড়া থেকেই বাঁধা ছিল হেডমাস্টারমশাইর। নিত্যনারায়ণবাবু ছোটোভাইদের থেকে শুরু করে তাঁর ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদের পর্যন্ত হেডমাস্টারমশাই পড়িয়েছেন। প্রথমে পনেরো টাকায় আরম্ভ করেছিলেন। চৌধুরীমশাইর নাতি-নাতনির সংখ্যা বছরের পর বছর বাড়তে থাকায় টিউশনির টাকার অঙ্কও বেড়ে বেড়ে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উঠেছিল। স্কুলে লিখতে হত ষাট, মিলত চল্লিশ। মাইনের সঙ্গে টিউশনির এই উপরি টাকার সংযোগে সংসার চলত।

কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর চৌধুরীরাও শেষপর্যন্ত দেশ ছাড়লেন। ছেলেরা পুত্রকলত্র নিয়ে কেউ কলকাতা, কেউ এলাহাবাদ, কেউ দিল্লি পর্যন্ত পাড়ি দিল।

নিত্যনারায়ণ নিজেও এলেন শহরে। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'আপনারা সবসুদ্ধ চলে গেলে চলবে কী করে? আমরা কী করব?'

নিত্যনারায়ণ বললেন, 'তাই তো, মাস্টার, তোমার সমস্যাটা তো রয়েই গেল, বাড়িতে ছেলেপুলে তো কেউ রইল না, পড়বে কে।'

নিত্যনারায়ণের চার বছরের নাতনি পাপড়ি পয়সার লোভে দাদুর পাকা চুল বেছে দিচ্ছিল, সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এল, কেন দাদু, সরকার কাকা রইলেন, দারোয়ান মন বাহাদুর রইল, ঝি রইল, মাস্টারমশাই তাদের তো পড়াতে পারবেন।

নিত্যনারায়ণ হো হো করে হেসে উঠেছিলেন, 'শুনলে? শুনলে মাস্টার? আমার দিদিমণির কথা শুনলে!'

কিন্তু নিত্যনারায়ণের হাসিতে সমস্যাটার সমাধান হয়নি। চৌধুরী চলে আসবার পর কুণ্ডুপাড়ায় হেডমাস্টারমশাই পাঁচ টাকার আরও দুটো টিউশনি পেয়েছিলেন, কিন্তু নেননি। সেকেন্ড মাস্টারমশাইর মাস্টারি ছাড়াও মাতুল সম্পত্তি আছে, থার্ড মাস্টারমশাইর আছে মুদি দোকান, হেড পণ্ডিতের উপার্জনক্ষম দুই ছেলে, সেকেন্ড পণ্ডিত শ্রীবিলাস চক্রবর্তীর যজমানি আর গুরুগিরি, কিন্তু হেডমাস্টারমশাইর সম্বল ছিলেন চৌধুরীরা। তিনি সবচেয়ে বেশি নিঃসম্বল হলেন। এদিকে পোষ্যের সংখ্যা অনেক।

গোড়ার দিকে তিনটি মেয়ে। তাদের দুটিকে অবশ্য পার করেছেন। একটি আছে এখনও ঘাড়ের ওপর। তারপর পর পর ছেলে হয়েছে তিনটি। বড়োটির বয়স সবে সাত।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'দেখলে বিধাতার মার। এমন অসময়ে ছেলেপুলেগুলি হল—।

নইলে গীতাকে কোনোরকমে পার করতে পারলে আমার আর ভাবনা ছিল কী? ওই হতচ্ছাড়াগুলোর জন্যই তো।

বুঝতে পারলাম ছেলেদের ভরণপোষণের ভাবনায় শেষপর্যন্ত দেশ আর মাস্টারি দুই-ই তাঁকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। মনে পড়ল এই হেডমাস্টারির ওপর কী মমতাই না ছিল মাস্টারমশাইর। টিচার হিসাবে সুখ্যাতি ছিল বলে রতনপুরে আর রাধাগঞ্জের দুইটি হাইস্কুলে মাস্টারমশাই চান্স পেয়েছিলেন। কিন্তু যাননি। হাইস্কুলে তো আর হেডমাস্টার হয়ে যেতে পারবেন না। একবার আমাদের সাগরপুর এম ই হাইস্কুল করবার প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিলেন হেডমাস্টারমশাই নিজে। কমিটির মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে উঠে বলেছিলেন, 'এ

প্রস্তাব নিতান্তই অযৌক্তিক। এ গাঁয়ে হাইস্কুল চলবে না, চলতে পারবে না। যদি বা চলে খুঁড়িয়ে চলবে। কিন্তু অখ্যাত একটি হাইস্কুলের চাইতে কীর্তিমান খ্যাতিমান একটি এম ই স্কুলকে আমি বহুগণে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।'

হেডমাস্টারের কথায় যুক্তি ছিল, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে দৃঢ়তা ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনের কোণের গোপন দুর্বলতাটুকু টের পেতে কমিটির অন্যান্য সভ্যদের দেরি হয়নি। এই নিয়ে তাঁরা কেবল গা টেপাটিপিই করেননি, আড়ালে আবডালে টিপ্পনীও কেটেছিলেন, এম ই স্কুল হাইস্কুল হলে আমাদের হেডমাস্টারের হেডটুকু যাবে যে? হেডমাস্টার সব ছাড়তে পারে, কিন্তু সাগরপুত্র এম ই স্কুলের ইন্দ্রত্ব কিছুতেই সে ছাড়তে রাজি নয়।

সেই ইন্দ্রপদও হেডমাস্টারমশাইকে ছেড়ে আসতে হল।

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রাম থামতেই হেডমাস্টারমশাই উঠে দাঁড়ালেন, 'এখানে নামতে হবে আমাকে। হরীশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বাসা, চল না নিরুপম। গীতা, গীতার মা তোমাকে দেখলে সবাই খুশি হবে। ওরাই তো আমাকে ঠেলে পাঠাল তোমার কাছে। গীতা কার কাছ থেকে যেন তোমার ঠিকানা জোগাড় করেছিল।'

মনে পড়ল না গীতার চেহারা, যখন মাইনর ক্লাসে পড়তাম দু-তিনটি ছোটো ছোটো ফ্রক পরা মেয়ে দেখেছিলাম হেডমাস্টারমশাইর। হয়তো তাদেরই কেউ হবে, কিংবা তাদেরও পরে জন্মেছে। কিন্তু গীতাকে মনে না পড়লেও তার মার কথা মনে পড়ল। লুকিয়ে লুকিয়ে তখন সবে নভেল পড়তে শুরু করেছি, নায়িকার রূপ বর্ণনা পড়তে পড়তে হেডমাস্টারমশাইর স্ত্রীর কথা মনে হত। অমন সুন্দরী বউ আমাদের গাঁয়ে চৌধুরী বাড়িতেও ছিল না

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কাজ ছিল একটু সন্ধ্যার দিকে, আচ্ছা চলুন দেখে যাই বাসা।'

কালীঘাটের টিনের বস্তি। তারই ভিতরে একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছেন হেডমাস্টারমশাই। সামনে খোলা দাওয়ায় তোলা উনানে রান্না উঠেছে।

হেডমাস্টারমশাই বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ঢুকলেন, 'আলোটা ধর গীতা, দেখ এসে নিরুপমকে নিয়ে এসেছি।'

ছোটো একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে, পিছনে পিছনে কৌতূহলী গুটি দুই ছেলেও এসে দাঁড়াল, হলুদ মাথা হাতে মাথায় আঁচল টানতে টানতে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একটু পুষ্টাঙ্গী একজন মহিলা। চিনতে পারলাম ইনিই মাস্টারমশাইর স্ত্রী।

মাস্টারমশাই বললেন, ‘নিরুপম নন্দী আমার স্কুল থেকে থার্টিটুতে স্কলারশিপ পেয়েছিল, ফার্স্ট হয়েছিল ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে। মনে আছে আমাদের বারান্দার তক্তপোশে রাত জেগে জেগে বৃত্তি পরীক্ষার পড়া পড়ত? নিরুপম নন্দী আর নুরুদ্দিন সিকদার। আচ্ছা নিরুপম, নুরুদ্দিন কোথায় আছে বলতে পারো?’

মাথা নেড়ে বললাম, ‘না।’

তারপর নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে গেলাম মাস্টারমশাইর স্ত্রীর।

তিনি দুপা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ‘থাক থাক।’

একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন, ‘তোমার নুরুদ্দিন ফুরুদ্দিন এখন রাখো তো।’

তারপর আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন, ‘আমাদের খুবই মনে আছে। তোমার বৃত্তি পাওয়া কীর্তিমান ছাত্রের দলই মাস্টারমশাইদের একেবারে ভুলে গেছে।’

মাস্টারমশাইর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আগেকার সেই স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের সামান্যই অবশিষ্ট আছে। মাস্টারমশাইর মতো অবশ্য অতটা চেহারা খারাপ হয়নি, দাঁত পড়েনি, কি চুলও পাকেনি। কিন্তু কঠিন জীবন সংগ্রামের ছাপ প্রৌঢ়ত্বকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। তা সত্ত্বেও হাসিটুকু ভারী ভালো লাগল, ভারী মিষ্টি লাগল অভিযোগের ভঙ্গিটুকু।

বললাম, ‘ভুলব কেন, তবে নানারকম কাজকর্মের চাপে খোঁজখবর আর নিয়ে ওঠা হয়নি।’

‘ওঁরা কি দাঁড়িয়ে থাকবেন মা। বসতে বল না তক্তপোশে।’

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। এই বোধহয় মাস্টারমশাইর মেয়ে গীতা। মায়ের মতো অত সুন্দরী নয়। রংটা একটু ময়লা। কিন্তু মায়ের চেয়ে স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু দীর্ঘ দোহারা চেহারায়, মুখে ডৌলে, নাক চোখের সুন্দর গড়নে ষোলো-সতেরো বছর আগেকার আর-একটি তরুণী গৃহিণীর কথা মনে পড়ল। জ্যামিতিক উপপাদ্য মুখস্থ করতে করতে হ্যারিকেনের তেল যখন ফুরিয়ে যেত, সলতে আসত নিবু নিবু হয়ে তখন মাস্টারমশাইর স্ত্রী উঠে এসে বোতল থেকে আমাদের হ্যারিকেনে তেল ঢালতে ঢালতে বলতেন, ‘আর পারিনে। বৃত্তি পেয়ে মাস্টারমশাইকে মহারাজ করবেন। কাল থেকে বোতলে করে বাড়ি তেল নিয়ে এসো নিজেরা। আমি আর-এক ফোঁটা তেল দিতে পারব না।’

কিন্তু নিপুণ হাতে হ্যারিকেনের মুখটুকু আটকে দিয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে স্নিগ্ধস্বরে বলতেন, ‘নিবু নুরুদ্দিন তোমাদের বোধহয় খুব মশা লাগছে।

মশারি টাঙিয়ে দিয়ে যাব? মশারির মধ্যে বসে পড়বে?'

নুরুদ্দিন জবাব দিত, 'না মাসিমা। মশারির মধ্যে গেলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। তার চেয়ে মশার কামড় বরং ভালো।

মাসিমা হেসে উঠতেন, 'প্রায়ই বিবেকের কামড়ের মতো তাই না? ওদিকে ঘরের মধ্যে মশারির ভিতরে আর-একজনকে বিবেক কামড়াচ্ছে। অতিষ্ঠ হয়ে তিনিও উঠে এলেন বলে।'

মাসিমা চলে গেলে আমি নুরুদ্দিন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতাম। মাইনর ক্লাসে পড়লে কী হয়, গোঁফের রেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঠোঁটে। গাঁয়ের ছেলে আন্দাজে আভাসে তখন থেকেই একটু-আধটু সব বুঝতে শিখেছি।

তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসে চা জলখাবার খেতে খেতে মাস্টারমশাইর আরও খানিকটা ইতিহাস শুনলাম মাসিমার মুখে। চৌধুরীরা ছেড়ে এলেও মাস্টারমশাই স্কুল ছাড়তে ইতস্তত করেছিলেন, বলেছিলেন, 'স্কুলের কী দশা হবে?'

মাস্টারমশাই স্ত্রী রাগ করে বলেছিলেন, 'যে দশা হয় হোক। আমাদের দশাটা কি তোমার চোখে পড়ছে না? স্কুলের ভাবনা কী, তুমি চলে গেলে সেকেন্ড মাস্টার হোক থার্ড মাস্টার হোক একজনকে ওরা হেডমাস্টার বানিয়ে নেবে। ভারী তো বিদ্যা লাগে তোমার ওই এম ই স্কুলের হেডমাস্টারিতে।'

মাস্টারমশাই তবুও বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু বুঝি না, তুমি থাকো তোমার হেডমাস্টারি নিয়ে, আমি চললাম। ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতে পারব না।'

মাসিমার দুই দাদা থাকেন ভবানীপুরে। একজন উকিল, আর-একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর, তাঁদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করলেন মাসিমা, তাঁরা বললেন, 'বেশ চলে এসো, একটা গতি হবেই।'

কিন্তু থাকবার মতো ঘর নেই বাড়িতে। সপ্তাহ দুই থাকবার পর নানারকম অসুবিধা হতে লাগল। দাদা বললেন, 'অন্য একটা ঘরটর কোথাও খুঁজে নে। আমরা যা পারি কিছু কিছু—'

এদিকে ঘরও মেলে না শহরে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে শেষে এই হরীশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের গলিতে মিলেছে বাসা। এই তো ঘর আলো নেই, হাওয়া নেই, জল আনতে হয় রাস্তার কল থেকে। তবু মাসে মাসে এরই ভাড়া গুনতে হয় কুড়ি টাকা। ছ-মাসের ভাড়া আগাম দিতে হয়েছে বাড়িওয়ালাকে। মাঝখানে পাড়ার একটা রেশনের দোকানে খাতা লেখার চাকরি পেয়েছিলেন মাস্টারমশাই কিন্তু

দুমাস যেতে না যেতে কী সব গণ্ডগোল গভর্নমেন্ট সে দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। এখন মাসখানেক ধরে একেবারে বেকার।

মাসিমা বললেন, 'তোমরা একটা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা এবার করে দাও নিরুপম।'

বললাম, 'আচ্ছা দেখি। আমাদের টালিগঞ্জ হাইস্কুলের সেক্রেটারির সঙ্গো মোটামুটি জানাশোনা আছে। তাঁকে বলে টলে সেই স্কুলে যদি মাস্টারমশাইকে—'

মাস্টারমশাই প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'না নিরুপম, আর মাস্টারি নয়। না খেয়ে মরব, তবু মাস্টারি আর জীবনে করব না। কেরানিগিরি থেকে কুলিগিরি যা বল করতে রাজি আছি। কিন্তু মাস্টারি আর নয়। সাতাশ বছর ধরে মাস্টারি করার সুখ তো দেখলাম। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।'

মাসিমা বললেন, 'উনি মাস্টারি আর করতে চাইছেন না। অন্য কোনো কাজকর্ম—'

আমি কিছু বলবার আগে গীতাই তার মাকে মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলল, 'কী যে বল মা, নতুন অফিসে ঢুকবার মতো বয়স, কি স্বাস্থ্য আছে, না কি বাবার।'

মাস্টারমশাই ধমক দিয়ে বললেন, 'না নেই, ওকে বলেছে নেই। কী হয়েছে আমার স্বাস্থ্যের। দ্যাখো নিরুপম, ছেলেবেলাও তো দেখেছ, এখনও দ্যাখো।'

বলে মাস্টারমশাই পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে তাঁর বাইসেপ দেখালেন আমাকে, 'It is as strong as ever.' দ্যাখো, টিপে দ্যাখো। তোমার প্রায় ডবল বয়সি হব তো আমি। কিন্তু বাজি রেখে বলতে পারি এখনও তুমি যতটা হাঁটতে পারবে, দৌড়োতে পারবে তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম পারব না আমি। কলেজ জিম্‌ন্যাসিয়ামে একদিনও কেউ আমাকে গরহাজির হতে দেখেনি। বয়স হয়েছে বলে শরীরের সেই ফরম-টরম একেবারেই কি ধুয়ে মুছে গেছে? স্পোর্টস-এও কারও চেয়ে কম যেতাম না। ফুটবলে অফেনসের চেয়ে ডিফেনসই আমাকে অবশ্য বেশি খেলতে হত। আমি যেদিন গোলে না দাঁড়াতাম—'

এবার স্ত্রীর ধমক খেলেন মাস্টারমশাই। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ থামো, ওসব কে শুনতে চাইছে তোমার কাছে।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'মাসেলটা একটু টিপে দ্যাখোই না নিরুপম।'

মাসেলের চাইতে মাস্টারমশাইর বাহুর ওপর দিয়ে যে রগগুলো জেগে উঠেছে তাই আমার চোখে পড়ল বেশি। তবু বললাম, 'না না না, শরীর তো বয়সের তুলনায় সত্যিই বেশ ভালো আছে আপনার। তাছাড়া বয়সটাই বা কি। ওদের দেশে তো শুনি ষাট বছরে জীবন কেবল আরম্ভ হয়। আপনার কত হবে?

বছর পঞ্চান্ন—'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী বললেন, 'না না না! এই বৈশাখে সবে একান্নতে পড়েছেন।' মাস্টারমশাই বললেন, 'এক্সাক্টলি, যাস্ট ফিফ্‌টিওয়ান। কিন্তু দৌড়ে, সাঁতারে যে-কোনো একুশ বছরের ছেলের সঙ্গে যদি তুমি আমাকে পাল্লা দিতে বল—'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী আবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'কী যা তা বলছ। অফিসের চাকরিতে দৌড়ঝাঁপের জন্য কে ডাকতে যাচ্ছে তোমাকে।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তবে ওঁর মতো ইংরেজি লিখতে আমি কাউকে আর দেখিনি নিরুপম। আমার বড়োদাদা এম এ বি এল হলে কী হবে ইংরেজিতে ওর সঙ্গে পেরে ওঠে না। লেখার বাঁধুনি তো দূরের কথা, হাতের লেখাটাই যেন কেমন কাঁচা কাঁচা, আমাদের মেয়েদের মতো। কিন্তু ওঁর লেখা সম্বন্ধে সে কথা কেউ বলতে পারবে না। আর লেখেনও খুব তাড়াতাড়ি। পাড়ার লোকের পক্ষ থেকে সেদিন ডাস্টবিন দেওয়া সম্বন্ধে কর্পোরেশনে একটা দরখাস্ত করেছিলেন। টাইপ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাতের লেখা কাগজটা আছে এখানে। কাগজখানা আন দেখি গীতা, দেখা তোর নিরুপমদাকে।'

গীতা কাগজখানা খুঁজতে লাগল।

মাস্টারমশাই তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, 'আমার ছাত্রের কাছে আমার বিদ্যার সার্টিফিকেট আর দিতে হবে না তোমাকে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত লেখার ব্যাপারে নিরুপম যেমন ছিলে স্লো, তেমনি ওর হাতের লেখা ছিল কদর্য। ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম ওকে নিয়ে। একটা বছর স্কুলের স্কলারশিপটা বুঝি বাদই যায়। অথচ অঙ্ক, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল সব বিষয়েই ভালো। কেবল ইংরেজি। ভাবলাম দু-বছরে একটা বিষয়ে কি আর টেনে তুলতে পারব না? থার্ডমাস্টার পণ্ডিতমশাই সব হাল ছেড়ে দিলেন, কিন্তু আমি অত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। হাতের প্রত্যেকটি অক্ষর ধরে ধরে শুধরে দিয়েছি, বেত মেরে মেরে মুখস্থ করিয়েছি গ্রামারের প্রত্যেক রুল।'

মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে পরম আত্মপ্রসাদে ফের হাসলেন, 'গ্রামারে আর বোধহয় তোমার ভুল হয় না, না নিরুপম?'

ভাষার গ্রামারের কথা জানি না, জীবনের গ্রামারে এখনও যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি হয়। কিন্তু সেকথা মাস্টারমশাইর কাছে স্বীকার না করে নিজের বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধির কথাই ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম।

ফেরার সময় সরু গলির মোড় পর্যন্ত দুজনেই এলেন পিছনে পিছনে।

মাস্টারমশাইর স্ত্রীর হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন। বিদায়ের আগে তিনি আর একবার বললেন, 'তোমার ভরসাতেই কিন্তু রইলাম নিরুপম।'

বললাম, 'আচ্ছা সাধ্যমতো চেষ্টা করব।'

চেষ্টা নয়, কিছু একটা তোমাকে করে দিতেই হবে। সবই তো শুনলে।'

বললাম, 'আচ্ছা'।

প্রথমে মার্চেন্ট অফিসের দু-চারজন বন্ধুকে বললাম মাস্টারমশাইর কথা। কেউ কেউ মুচকি হাসল, কেউ বা সশব্দে। মার্টিনের সতীশ বলল, 'এতই যদি গুরুভক্তি নিজের ব্যাংকেই নিয়ে যাও-না-কেন।'

ধরলাম জেনারেল ম্যানেজার মি. গুপ্তকে। লোকজন নেওয়ার ভার তাঁরই হাতে।

তিনিও প্রথমে হাসলেন, 'বলছ কী নন্দী। একান্ন বছর বয়সে নতুন চাকরি। তারপর সাতাশ বছরের মাস্টারি। শুনি ও কাজ বারো বছর করলেই না কি—। ব্যাংকের এসব ফিগার ওয়ার্ক টোয়ার্ক তিনি কি পারবেন? তা ছাড়া খাটুনিও তো কম নয়।'

বললাম, 'তিনি বলেছেন, মাস্টারি ছাড়া তিনি সব পারবেন, সব করবেন। মাস্টারিতে না কি তাঁর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। যাই হোক আমাদের ব্যাংকে ওঁকে একটা চান্স আপনার দিতেই হতে মিস্টার গুপ্ত।'

'আচ্ছা, তুমি যখন বলছ অত করে দেখা যাক।'

ইন্টারভিউর জন্য আর চিঠি পাঠানো হল না। মুখেই খবর দিয়ে এলাম। সবাই খুব খুশি। গীতা বলল, 'না নিরুপমদা, চা না খেয়ে যেতে পারবেন না।

মাস্টারমশাইর স্ত্রী বললেন, 'দেখ দেখি বৈয়মটায় সুজি আছে খানিকটা। আর ওই টিনের কৌটার মধ্যে চিনি আছে।'

বললাম, 'আবার ওসব কেন? শুধু চা হলেই তো হত।'

'ওই চা-ই, চা ছাড়া আর কীইবা তোমার সামনে ধরে দেওয়ার শক্তি আছে।'

চায়ের সঙ্গে একটু হালুয়াও প্লেটে করে সামনে এনে রেখে দিল গীতা।

মৃদু হেসে বললাম, 'মিষ্টিমুখটা চাকরি হওয়ার পরে করালেই তো ভালো হত।

গীতা কোনো জবাব দিল না, তার মা বললেন, 'তুমি যখন রয়েছ, ও চাকরি হওয়ার মধ্যেই। তা ছাড়া চাকরির জন্য কী। গরিব মাস্টারমশাইর বাসায় অমনিতেই না হয় একটু চা আর খাবার খেলে। তাতে জাত যাবে না।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'মাস্টারি ছেড়ে দিলাম, তবু মাস্টার মাস্টার করা

ছাড়লে না তোমরা।' মাস্টারমশাইর স্ত্রীও এবার হাসলেন একটু, 'আহা ছেড়ে দিলেও নিরুপমের তো মাস্টারমশাই তুমি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'এখনও আছি, কিন্তু দু-দিন বাদে চাকরিটা যদি হয়েই যায় ওদের ওখানে, তখন আর মাস্টার নয়, কলিগ, সাবঅরডিনেট।'

চাকরি হলও। মি. গুপ্ত খুবই ভদ্রতা করলেন। ইন্টারভিউতে নাম ধাম ছাড়া বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কেবল বলেছিলেন, 'এতদিনের মাস্টারি ছাড়লেন কেন, তাছাড়া ব্যাংকের কাজকর্ম কি আপনার ভালো লাগবে।'

মাস্টারমশাই জবাব দিয়েছিল, 'মাস্টারির মনোটনির তুলনায় সব কাজই বোধহয় ভালো।'

মি. গুপ্ত মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'বেশ দেখুন, কেমন লাগে।'

বিশেষভাবে ধরে পড়ায় মাইনের বেলায়ও বেশ একটু খাতির করলেন মি. গুপ্ত, আমাদের ব্যাংকে সাধারণ আন্ডার গ্রাজুয়েটদের স্টার্টিং ষাটে। জেনারেল ম্যানেজারকে বললাম, 'কিন্তু ওঁর নিজের বয়সই তো প্রায় ষাট হতে চলল, এই বয়সে ষাট টাকা দিয়ে উনি করবেন কী, —তাছাড়া অতগুলি পোষ্য।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে খানিকক্ষণ কী পরামর্শ করে আরও খানিকটা দাক্ষিণ্য দেখালেন জেনারেল ম্যানেজার। স্পেশাল কেস হিসেবে গণ্য করে ষাট থেকে উঠলেন পঁচাশিতে। বললেন, 'দেখি কাজকর্ম কী রকম করেন না করেন, তারপর দেখা যাবে।'

সপরিবারে মাস্টারমশাই কৃতজ্ঞতা জানালেন। এম ই স্কুলে সারাজীবন থাকলেও এত টাকা পেতেন না মাস্টারমশাই।

চৌধুরীদের টিউশনির টাকা ধরেও সংখ্যাটা অতখানি উঁচুতে পৌঁছোত কি না সন্দেহ। খবর পেয়েই কালীবাড়িতে ডালা পাঠিয়েছিলেন মাস্টারমশাইর স্ত্রী। গীতার চায়ের সঙ্গে ফুলের পাপড়ি সুদ্ধ প্রসাদের অংশও পেলাম।

গীতা মৃদুস্বরে বলল, 'মা ভারী খুশি হয়েছেন।'

বললাম, 'আর তুমি?'

গীতা বলল, 'আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিন, আমিও হব।'

হেসে বললাম, 'খুশি হবার জন্য জুটিয়ে অবশ্য তোমাকে কিছু একটা দিতে হবে, কিন্তু সে চাকরি কি না তাই ভাবছি।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে গীতা একটু আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট সরল গদ্যে বলল, 'না নিরুদা আজকালকার মেয়েদের আর

কিছু জুটিয়ে দিয়ে খুশি করবার দরকার হয় না। তার চাইতে একটা কাজকর্মের সন্ধান দিলেই তারা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়।'

প্রথমে পরিমলবাবুর ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টই দিলাম মাস্টারমশাইকে, তিনি লোক চেয়েছিলেন। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও অবশ্য লোকের দরকার। তবু পরিমলবাবুকেই সবচেয়ে আগে খাতির করলাম।

পরিমলবাবু কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়ে খুব খুশি হলেন না। বললেন, 'শেষ পর্যন্ত একজন চুল পাকা বুড়োকে পাঠালেন আমার ডিপার্টমেন্টে?'

পরিমলবাবুর নিজের বয়সও চল্লিশ বিয়াল্লিশের কম হবে না, ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছেলের সন্ধান করেন আমার কাছে।

হেসে বললাম, 'অত বয়স বিচার করছেন কেন পরিমলবাবু? জামাই তো আর নিচ্ছেন না, অ্যাসিস্ট্যান্টই নিচ্ছেন। বয়স দিয়ে কী হবে, আপনার কাজ চলে গেলেই হল। গোড়াতে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে।'

ছুটির পর ডালহৌসির মোড়ে মাস্টারমশাইর সঙ্গে দেখা। দেখলাম এই বয়সে প্রায় তরুণ জামাইর মতোই সেজেছেন মাস্টারমশাই। যখন স্কুলে পড়েছি, তখন এত পারিপাট্য দেখিনি। ইস্ত্রি করা সাদা পাঞ্জাবিতে কালো বোতাম লাগানো। ঝুলন্ত কোঁচাটা নিপুণ হতে কোঁচানো, পায়ের পাম্‌শুটা পুরনো হলেও সদ্য পালিশে চক্‌ চক্‌ করছে। গোঁফ দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। চুলটা বোধহয় আজই ছেঁটেছেন। সেলুনের ছাঁট বেশ বোঝা যায়। স্কুলে যখন ছিলেন, তখন জামা থাকত বোতাম থাকত না, হয়তো দু-পাটি চটির দু-খানা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

বললাম, 'অফিসে কেমন লাগছে মাস্টারমশাই?'

মাস্টারমশাই একটু হাসলেন, বললেন, 'ভালোই তো?'

ট্রামে পাশাপাশি বসে হঠাৎ বলে ফেললাম, 'একদিনেই আপনি যেন আমূল বদলে গেছেন। স্কুলের অন্যান্য মাস্টারমশাইরা আপনাকে দেখলে এখন আর চিনতে পারবে না।'

মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন?'

বললাম, 'তখনকার পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে একেবারেই তো কোনো মিল নেই কি না। এবার দাঁত দুটো বাঁধিয়ে নিলেই— মনে হল ঠিক আগেকার দিনের মতো ক্রুদ্ধ চোখে মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকালেন।

একটু লজ্জিত হলাম। এতখানি প্রগল্‌ভতা হঠাৎ না দেখালেও পারতাম।

তখনকার দিনে হেডমাস্টারমশাইর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতাম না, আর এখন দিব্যি ঠাট্টাতামাশা করছি। এতখানি আধুনিকতা মাস্টারমশাই সহ্য করতে পারবেন কেন।

ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম মাস্টারমশাইর তাকাবার ভঙ্গিটা এরই মধ্যে বেশ বদলে গেছে।

মনে হল আমার দিকে চেয়ে মাস্টারমশাই একটু হাসলেন, বললেন, 'ও আমার সাজসজ্জার কথা বলছ। তুমি ভেবেছ এসব আমি নিজের গরজে নিজের হাতে করছি?'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তবে? গীতা বুঝি?'

মাস্টারমশাই মাথা নেড়ে রহস্যগভীর স্বরে বললেন, 'তাও নয়।'

বললাম, 'তবে?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'লাবণ্য, I mean গীতার মা,' মাস্টারমশাইর স্ত্রীর নামটা এবার মনে পড়ে গেল। তখনকার দিনে লাবণ্যলেখা সরকারের নামে প্রায়ই চিঠি যেত ডাকে। গাঁয়ে পোস্টঅফিসে পিয়োন ছিল না। পোস্টমাস্টারের হাত থেকে আমরাই চিঠি নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিতাম। ভারী সুন্দর লেগেছিল নামটি। লাবণ্যলেখা, মনে হয়েছিল তাঁর স্বভাবের সঙ্গে, চেহারার সঙ্গে নামটি চমৎকার মানিয়ে গেছে। এছাড়া তাঁর অন্য কোনো নাম যেন কল্পনাই করা যেত না।

এতদিন বাদে স্ত্রীর নাম আমার সামনে উচ্চারণ করে ফেলে মাস্টারমশাই নিজেও যেন ভারী লজ্জিত হয়ে পড়লেন। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকালেন বাইরের দিকে, গড়ের মাঠের ওপারে গঙ্গা, গঙ্গার ওপারে লাল হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। লজ্জায় কি আরক্ত দেখাচ্ছে মাস্টারমশাইর মুখ, নাকি এ রং সূর্যাস্তের। একটু বাদে ফের মুখ ফেরালেন, মাস্টারমশাই বললেন, 'এ সব গীতার মার কাণ্ড। বাধা দিয়েছিলাম, বলেছিলাম লোকে হাসবে যে। সে জোর করে বলল, না হাসবে না। আর হাসে যদি হাসলই বা। এতদিন নিজের হাতে বেশভূষা করে লোক হাসিয়েছ আর না হয় আমার জন্যই হাসালে।'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'না না হাসবার কী হয়েছে মাস্টারমশাই।'

মাস্টারমশাই আমার কথা যেন শুনতে পাননি, নিজের মনেই বললেন, 'ভাবলাম ওর কোনো সাধ আহ্লাদ তো মেটেনি, আজ যদি ওভাবে একটু মেটাতে চায় মেটাক।'

মনে হল আমার পাশে বসে আমাদের ছেলেবেলার বেত হাতে সেই কড়া

হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার আর কথা বলছেন না, অন্নচিন্তায় কাতর পঞ্চাশ বছরের কোনো প্রৌঢ় কেরানিও নয়, ইনি সম্পূর্ণ আর একজন। স্ত্রীর অপূর্ণ সাধ আহ্লাদের কথা জীবন সায়াহ্নে যাঁর মনে পড়ে গেছে।

কথায় কথায় এম ই স্কুলের হেডমাস্টারের জীবনের আর-এক গোপন অধ্যায় আমার কাছে উদ্ঘাটিত হল।

লাবণ্যলেখা তখন গীতা, গোবিন্দের মা নন এমনকি আমাদের শ্রদ্ধেয় হেডমাস্টারমশাইর স্ত্রীও নন; সিটি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র কৃষ্ণপ্রসন্নের শখের ছাত্রী তখন লাবণ্য।

কৃষ্ণপ্রসন্ন তখন কলেজ হেস্টেলে থাকে। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে ডিবেটিং ক্লাবে জোর বিতর্ক করে। জিমনাশিয়ামে বারবার বারবেলের খেলা দেখায়। ফুটবলে তেমন আসক্তি না থাকলেও টিমের ক্যাপটেন জোর করে তার হাতে তুলে দেয় গোলরক্ষার দায়িত্ব, এসব ছাড়া অবসর বিনোদনের আরও একটু জায়গা আছে কৃষ্ণপ্রসন্নের, শ্যামবাজারের নলিন সরকার স্ট্রিটের একটি দ্বিতল বাড়ির দক্ষিণ খোলা একখানা ঘরে। বাড়িটি একেবারে নিঃসম্পর্কিত নয়। জ্যাঠতুতো বোনের শ্বশুরবাড়ি। দিদির শ্বশুরের সেজো মেয়ে লাবণ্য। চোদ্দো উতরে পনেরোয় পড়েছে। পড়াশুনোয় ভারী আগ্রহ। কিন্তু দিদির শ্বশুরমশাই এসব বিষয়ে ভারী রক্ষণশীল। মেয়েকে ইংরেজি স্কুলের দু-তিন ক্লাস পড়িয়েই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। এনে তুলে দিয়েছেন পাকা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো মাস্টারের হাতে। কৃষ্ণপ্রসন্নের পরমভাগ্য দিদির শ্বশুরবাড়িতে যাতায়াত শুরু করার দিন পনেরো যেতে না যেতেই সেই বুড়ো মাস্টারের শক্ত অসুখ হল। দিদির শ্বশুরের মতো বর আর দেবরেরা সেকেলে নয়। তাঁরা বললেন, 'লাবুর পরীক্ষা এসেছে, কৃষ্ণপ্রসন্ন তুমিই একটু ওকে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও না।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন জিভ কেটে বলে, 'ওরে বাবা, থিয়েটার বাড়ি থেকে নারদের এক গোছা পাকা দাড়ি তাহলে ধার করে আনতে হয়।'

কিন্তু দাড়ি ধার করবার দরকার হল না। দিদি আর দিদির শাশুড়ির সার্টিফিকেটে কৃষ্ণপ্রসন্নই তরুণ হয়েও বসতে শুরু করল সেই বুড়ো মাস্টারের পরিত্যক্ত চেয়ারে। প্রথমে কেউ কোনো কথা বলে না, কেউ কারো দিকে তাকায় না, বইয়ের দিকে দুজনেই চোখ নীচু করে থাকে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি সে ছাপার অক্ষরে আবদ্ধ থাকে না। তারপর মাস তিনের বাদে ফের যখন সেই বুড়ো মাস্টারমশাইয়ের আসবার কথা হল, লাবণ্য বলল, 'আমি আর তাঁর কাছে পড়ব না।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বলে, 'তবে কার কাছে পড়বে?'

'এখন যার কাছে পড়ছি।'

'বা রে আমি কি সারা জীবন মাস্টারি করব না কি?'

লাবণ্য হেসে বলল, 'করবেই তো মাস্টারির মতো এমন মহৎ কাজ আর নেই।'

কিন্তু দু-বছর বাদে গাঁয়ের এম ই স্কুলে হেডমাস্টারি নেওয়ার সময় এই লাবণ্যই সবচেয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। জ্যাঠতুতো বোনের মধ্যস্থতার লাবণ্য তখন শুধু আর কৃষ্ণপ্রসন্নের ছাত্রীই নয়, সাগরপুর সরকার বাড়ির বউ হয়ে ঘরে এসেছে। আর বি এ পরীক্ষা দিতে বসে এক জাতি ভাইয়ের মুখে স্ত্রীর ডবল নিউমোনিয়ার খবর পেয়ে পরীক্ষার হল ছেড়ে একেবারে দেশে চলে এসেছে কৃষ্ণপ্রসন্ন। বাবা বললেন, 'ইচ্ছা করেই আমরা খবর দিইনি। পরীক্ষার চেয়ে তোর বউ বড়ো হল?

কৃষ্ণপ্রসন্ন বলল, 'স্ত্রীর জীবনের চাইতে আমার পরীক্ষা বড়ো নয়।'

রোগটা ঠিক ডাবল নিউমোনিয়া ছিল না। অল্পদিনেই লাবণ্য উঠে বসল এবং উঠে বসেই বলল, 'তোমার পরীক্ষার কী হল?'

কৃষ্ণপ্রসন্ন জানাল পরীক্ষা সে দেয়নি।

লাবণ্য বলল, 'ছি ছি ছি আমার জন্য তুমি পরীক্ষা বন্ধ করলে? আমি মুখ দেখাব কেমন করে? তুমি এক্ষুনি ফের কলকাতায় চলে যাও।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন অতদূর গেল না। তখন দক্ষিণ পাড়ার চৌধুরীদের উদ্যোগে নতুন এম ই স্কুলে হচ্ছে গাঁয়ে। নিত্যনারায়ণ তাকে ধরে বসলেন, 'তোমার কলেজ খোলার তো ঢের দেরি। তার আগে আমাদের স্কুলটা একটু ঠিকঠাক করে দিয়ে যাও।' তারপর কতবার কলেজ খুলল, বন্ধ হল। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্নের আর যাওয়া হল না।

লাবণ্য বলেছিল, 'তুমি কি সত্যিই মাস্টারি নিলে?' কৃষ্ণপ্রসন্ন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হেসেছিল, 'নিলামই বা। মাস্টারিই তো সবচেয়ে মহৎ বৃত্তি।'

বাড়ির আর গাঁয়ের সব লোক জানল বউকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে পারবে না বলেই কৃষ্ণপ্রসন্ন বিদেশে গেল না। এমন স্ত্রৈণ পুরুষ আর দুটি নাই। লাবণ্য জানল অবশ্য অন্য কথা। তারপর—তার একটানা সাতাশ বছর।

হাজরা রোডের মোড়ে নেমে যাওয়ার আগে ফের সাতাশ বছরের পরের একটু খবর দিয়ে গেলেন মাস্টারমশাই, হেসে বললেন, 'ছেলেমেয়েদের চোখের আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে গীতার মা চুপি চুপি আমাকে কী জিজ্ঞেস করেছিল জানো নিরুপম?'

বললাম, 'কী জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

মাস্টারমশাই একটু হাসলেন, 'আচ্ছা, নিরুপমের মতো সবাই কি স্যুট পরে আসে? তার মানে সবাই যদি স্যুটধারী হয়, তাহলে আমারও পরিত্রাণ নেই। তাহলে তাঁর বড়োবউদির কাছ থেকে তাঁর দাদার পুরোনো একটা স্যুট ধার করে আনবেন আর তাঁর বউদিদির মতোই নিজের হাত টাই বাঁধবেন আমার গলায়।' হেসে বললাম, 'সামনের মাসে আপনাকে একটা স্যুট আমি করিয়ে দেব মাস্টারশাই।'

পাগল না কি? এই ধুতি পাঞ্জাবির চোটেই অস্থির। দুবার ধরে নিজের হাতে কেচেছে, পাশের বাসার ইস্ত্রিটা চেয়ে এনে ইস্ত্রি করেছে, কেবল কী তাই? কোঁচাটা পর্যন্ত নিজের পছন্দমতো কুঁচিয়ে দেওয়া চাই। বলে কী জানো। —'এ তো তোমার গাঁয়ের স্কুল নয়, শহরের অফিস।' হেডমাস্টারমশাই ফোকলা দাঁতে একটু হাসলেন। তা সত্ত্বেও দাঁতের সেই বিশ্রী ফাঁক আমার চোখে তেমন যেন আর বিসদৃশ লাগল না। কারণ সাতাশ বছর আগেকার সেই লাবণ্য আর কৃষ্ণপ্রসন্ন আমার মনকে তখনও আচ্ছন্ন করে রয়েছে।

কিন্তু মাস্টারমশাই সম্বন্ধে এই রোমান্টিক আচ্ছন্নতা বেশিদিন বজায় রইল না। সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই ঝড়ের বেগে ক্লিয়ারিং-এর পরিমলবাবু আমার চেম্বারে এসে ঢুকলেন।

বললাম, 'ব্যাপার কী পরিমলবাবু?'

'আচ্ছা নিরুপমবাবু, ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ আমি না কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু?'

বললাম, 'আপনি, এ তো সবাই জানে?

'কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু জানেন না। জানলেও মানেন না।' তারপর অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ দিলেন পরিমলবাবু। অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েও কথায় কথায় তাঁর সমালোচনা করেন মাস্টারমশাই। ছোকরা কর্মচারীদের সামনে তাঁর ইংরেজির ভুল ধরেন। কথাবার্তায় খুঁত ধরেন। মুহূর্তে মুহূর্তে কাজের ব্যাঘাত হয়। পরিমলবাবু বললেন, 'লোকের আমার আর দরকার নেই মশাই, একজন লোক শর্ট নিয়ে আমি আজীবন কাজ করতে রাজি আছি। রাত দশটা পর্যন্ত থাকতে হয় তাও স্বীকার। কিন্তু এই বুড়োকে আপনি সরিয়ে নিন। দুষ্টু গোরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভালো।'

পরিমলবাবুকে যেতে বলে মাস্টারমশাইকে ডেকে পাঠালাম। তাঁর মুখও থম থম করছে।

বললাম, 'ব্যাপার কী মাস্টারমশাই? পরিমলবাবুর সঙ্গো না কি আপনি ঝগড়া করেছেন।'

মাস্টারমশাই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ঝগড়া? ওকে যে বেতিয়ে পিঠ লাল করে দিইনি আমি সেই ওর—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'থামুন থামুন। করেছেন কী তিনি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'প্রথমে তো, এক লাইনও ইংরেজি লিখতে পারবে না। একটা সেনটেন্স দুটো বানান ভুল, তিনটে গ্রামাটিক্যাল মিসটেক। শুধরে দিলেও শুনবে না, কেবল উড়ো তর্ক।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'বেশ লিখছে লিখুক ভুল ইংরেজি। তা না হয় নাই ধরলাম। কিন্তু ছেলের বয়সি সব ছোকরা। তাদের সঙ্গো প্রকাশ্যে অফিসের মধ্যে এসব কী ইয়ার্কি। ভদ্রঘরের মেয়েদের কথা নিয়ে, সিনেমাস্টারদের নিয়ে এমনকি ব্রথলের—। ছি ছি ছি। এ সব তুমি সহ্য করতে বল নিরুপম?'

আদিরসে পরিমলবাবুর একটু বেশি আসক্তি আছে। আট-ন ঘণ্টা কলম পিষে পিষে অন্তরাত্মা যখন শুকিয়ে আসে, ঝিমিয়ে আসে, অল্পবয়সি কেরানির দল তখন স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত ব্যাংকে নানা ধরনের মেয়েদের প্রসঙ্গ আর যৌনজীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুললে তিনি নিজের এবং সহকর্মীদের কলম-মন দুই-ই রসাপ্লুত করেন। এ খবরটা আমি জানি। কিন্তু পরিমলবাবু কাজকর্মে ভারী দক্ষ লোক। ক্লিয়ারিং মেলাতে ওঁর মতো যোগ্যতা আর কারো নেই ব্যাংকে।

মাস্টারমশাইকে বললাম, 'এখানে সবাই কলিগ। অত বাদ বিচার—'

মাস্টারমশাই তেমনি তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'কলিগ তাই বলে স্থানকালপাত্রভেদ নাই? অশ্লীল অশ্রাব্য আলোচনায় ছেলের বয়সি ছাত্রের বয়সি সব ছোকরাদের মাথা চিবিয়ে খেতে হবে? ফের যদি পরিমলবাবুর মুখে আমি এই সব কুৎসিত কথা শুনি, আমি থাপ্পড় মেরে গাল ভেঙে দেব। হাতাহাতি হয়ে যাবে আমার সঙ্গো।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'আচ্ছা যান। আমি এর ব্যবস্থা করব।'

সেইদিনই মাস্টারমশাইকে স্থানান্তরিত করলাম বিল ডিপার্টমেন্ট। পরিমলবাবু থেকে তাঁর অল্পবয়সি সহকারীরা সবাই খুশি।

'বাঁচিয়েছেন নিরুপমবাবু। আর-এক সপ্তাহ মাস্টারমশাইর সঙ্গো থাকলে আমরা পাগল হয়ে যেতাম। লোক আপনি পারেন দেবেন, না পারেন না দেবেন, কিন্তু

মাস্টার-টাস্টার আর পাঠাবেন না।'

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয়ও কাটল না। বিল ডিপার্টমেন্টেও ফের গোলমাল উঠল। বিলের ইনচার্জ ননীবাবু এসে গম্ভীর মুখে নালিশ করলেন, 'মাস্টারমশাইকে সরিয়ে নিন। ওঁর দ্বারা আমার কাজ চলবে না।'

মাস্টারমশাই নামটা এরই মধ্যে সমস্ত ব্যাংকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বললাম, 'কী হয়েছে ননীবাবু।'

'আরে মশাই, নিজে কাজকর্ম কিছু বুঝবেন না, বুঝতে চেষ্টা করবেন না। কেবল আমার দোষ ধরবেন। কার দ্বারা কতটুকু কাজ হয় না হয়, আমি জানি, আমি বুঝি। ডিপার্টমেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারে উনি কেন মাথা গলাতে আসেন বলেন তো। ওঁর সঙ্গে কাজ করা Impossible, বিল থেকে হয় ওঁকে আপনি সরিয়ে নিন, না হয় আমাকে সরান। আপনি যদি কোনো ব্যবস্থা না করেন, আমি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করব।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'আচ্ছা দেখছি।' মাস্টারমশাইকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম, 'ব্যাপার কী, আপনার নামে ফের কমপ্লেন এসেছে।'

তিনি বললেন, 'কমপ্লেন? আমি ননীবাবুর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করছি। মানুষ না ব্রুট।'

বললাম, 'ব্যাপারটা কী।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'ব্যাপার কী আর। ক্লিক, কেবল ক্লিক। জন পাঁচেক মাত্র লোক ডিপার্টমেন্টে। তার মধ্যে দুটো ক্লিক। একজন আর-একজনের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে ইনচার্জের কাছে। কিন্তু ননীবাবু তো হেড অব দি ডিপার্টমেন্টে। তাঁর তো উচিত নিরপেক্ষ থাকা, সুবিচার করা। কিন্তু পক্ষপাত তাঁরই সবচেয়ে বেশি। নির্মল বলে একটি ছেলে আছে। সবে ম্যাট্রিক পাস করে আই-কম-এ ভর্তি হয়েছে। ছেলেটি একটু স্পষ্ট বক্তা। সেই জন্য ননীবাবুর যত আক্রোশ তাঁর ওপর।'

বললাম, 'তা থাক, আপনি ওর ভিতরে না গেলেই তো পারেন।'

মাস্টারমশাই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'বল কী তুমি? না গেলেই পারি? আমার চোখের সামনে ছেলেটাকে এমন করে নির্যাতিত করবে আর আমি কোনো কথা বলব না? পাঁচটার মিনিট কয়েক আগে থেকে ননীবাবু এমন করে কাজ চাপাবেন ওর ঘাড়ে যে সপ্তাহে ছেলেটির চার-পাঁচ দিন কলেজ কামাই হয়। এই তো একরত্তি ছেলে, খাটাতে খাটাতে ওর জিভ বের করে ফেলেছেন ননীবাবু। কথা না বলে কোনো মানুষে পারে?

বললাম, 'ননীবাবু জেনারেল ম্যানেজারের নিজের ভাগ্নে। তিনি যদি কোনো রিপোর্ট টিপোর্ট করেন তাহলে কিন্তু চেষ্টা করেও আমি আপনার চাকরি রাখতে পারব না মাস্টারমশাই, মাস্টারির মায়া যখন ছেড়েছেন একেবারে ছাড়ুন। অফিসে এসে আর কক্ষনো মাস্টারি করবেন না মাস্টারমশাই।'

আমার শাসনের ভঙ্গিতে মাস্টারমশাই বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন, 'না বাবা দোহাই তোমার, চাকরি টাকরির যেন কোনো গোলমাল না হয়। তুমি বরং ননীবাবুকে আমার হয়ে। —আচ্ছা আমিও না হয় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব।'

বললাম, 'ক্ষমা চাওয়ার হয়তো দরকার হবে না, কিন্তু সব সমঝে চলবেন।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'আচ্ছা নিরুপম তাই চলব। কিন্তু খবরদার, তুমি যেন আমার বাসায় গিয়ে অফিসের এসব গোলমালের কথা বল না বাবা। গীতার মা শুনলে—।'

হেসে মাস্টারমশাইকে অভয় দিয়ে বললাম, 'না, তিনি এসব জানতে পারবেন না।'

কিন্তু দুদিন বাদে ফের মাস্টারমশাইর নামে ননীবাবু অভিযোগ করলেন। তিনি ফের ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেছেন। তাঁকে নিয়ে কাজ করা অসম্ভব।

সুতরাং আবারও অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলি করতে হল মাস্টারমশাইকে।

মাস্টারমশাই মুখ ভার করে বললেন, 'বারবার তুমি আমারই দোষ দেখছ নিরুপম। শাস্তি দিয়ে আমাকেই সরাচ্ছ।'

বললাম, 'তা ঠিক নয় মাস্টারমশাই, কিন্তু অফিসের একটা ডিসিপ্লিন আমাকে মেনে চলতে হবে। ননীবাবু এখানকার পুরোনো লোক আর খুব এফিসিয়েন্ট হ্যান্ড। তা ছাড়া জেনারেল ম্যানেজারের—।'

মাস দুয়েকের মধ্যে ব্যাংকের প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেন্টেই মাস্টারমশাইকে ঘুরিয়ে আনলাম। লেজার, লোন, ফিক্সড ডিপোজিট, অ্যাকাউন্টস, ডেসপ্যাচ—কোনো বিভাগই বাদ রইল না, কিন্তু সব জায়গা থেকে অভিযোগ আসতে লাগল। মাস্টারমশাই সর্বত্রই অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি 'কেঅস' সৃষ্টি করছেন অফিসে। তাঁকে নিয়ে কাজ করা অসম্ভব। কর্তৃপক্ষের কাছেও তাঁর নামে রোজ নানা ধরনের অভিযোগ যেতে শুরু করল।

ভারী চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মাস্টারমশাইর চাকরি বুঝি আর রাখা গেল না।

এর মধ্যে একদিন তাঁর বাসায়ও গেলাম। খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন মাস্টারমশাইর স্ত্রী। নানারকম তরকারি রেঁধে পাতের চার ধারে সাজিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ

কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'উনি কেমন কাজকর্ম করছেন নিরুপম।'

আশায় উৎসুক তাঁর দুটি চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফের ভাত মাখতে মাখতে মুখ নীচু করে জবাব দিয়েছিলাম, 'ভালোই।'

তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল স্বরে বলেছিলেন, 'কেমন, বলিনি গীতা? ইচ্ছা করলেই উনি পারবেন।'

গীতা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল, 'বাঃ রে, পারবেন না আমি বলেছি না কি?'

কিন্তু ডেসপ্যাচ থেকেও যখন ক্রমাগত অভিযোগ আসতে লাগল আমি মাস্টারমশাইকে ডেকে বললাম, 'কেয়ার টেকার প্রফুল্লবাবু কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, আপনি তাঁর জায়গায় কাজ করুন, বেয়ারাদের দেখাশোনা করবেন।'

মাস্টারমশাই অভিমানের সুরে বললেন, 'সমস্ত না শুনে, না জেনে বারবার তুমি আমাকেই জব্দ করছ নিরুপম। ডেসপ্যাচার ভুবনবাবু সেদিন কানাই বেয়ারাকে সামান্য কারণে যেভাবে গালাগালি করেছিলেন তা কোনো ভদ্রলোক করে না, কোনো ভদ্রলোক তা সইতেও পারে না, আমি আপত্তি করেছিলাম, তাই বুঝি তিনি এসে লাগিয়েছেন?'

বললাম, 'সে যাক্ আপনি আজ থেকে বেয়ারাদের ভার নিন। ওরা কখন আসে যায় লক্ষ রাখবেন, যে ডিপার্টমেন্টে যে ক-জন বেয়ারার দরকার হয় ঠিক মতো হিসাব করে দেবেন। দেখবেন কেউ যেন কাজে ফাঁকি না দেয়, চুপচাপ বসে না থাকে। এই হল মোটামুটি কাজ। বোধহয় এতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।'।

রাগে-অভিমানে মাস্টারমশাই যেন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপর বললেন, 'তার মানে তুমি আমাকে অপমান করছ। তার মানে বেয়ারাদের সর্দারি করা ছাড়া আর কোনো কাজের যোগ্য বলে তুমি আমাকে মনে করছ না।'

বিরক্ত হয়ে ফাইল থেকে মাথা তুলে বললাম, 'কী মনে করছি, না করছি সে সব আলোচনা পরে আর-এক সময় করব মাস্টারমশাই। আপাতত আমি ভারী ব্যস্ত।'

'মাস্টারমশাই বেরিয়ে গেলেন।

প্রথম দিনকয়েক বেয়ারাদের কাছ থেকেও অভিযোগ আসতে লাগল, মাস্টারমশাই বড়ো রূঢ়ভাষী। হাজিরা সম্বন্ধে ভারী কড়াকড়ি তাঁর। চালচলন আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ভারী খুঁতখুঁতি। একদিন না কি কী একটা বেফাঁস কথা বলে

ফেলার জন্য শীতলকে চড় মেরেছিলেন।

কিন্তু সপ্তাহ দুই বাদে অভিযোগের ধরনগুলি অন্যরকম হতে শুরু করল। মাস্টারমশাই বেয়ারাদের হয়ে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গো ঝগড়া করেছেন। কোনো বেয়ারাকে একটু কড়া কথা বলবার উপায় নেই, মাস্টারমশাই তেড়ে এসে প্রতিবাদ করবেন। কোনো ব্যক্তিগত কাজকর্মে তাদের পাঠানো চলবে না। মাস্টারমশাই বলেন, 'তা হলে অফিসের কাজ সাফার করে। বাবুদের কেবল পান, সিগারেট জোগাবার জন্য ওদের রাখা হয়নি।'

ক্লিয়ারিং-এর পরিমালবাবু এসে একদিন বললেন, 'ভালো চান তো বেয়ারাদের সর্দারি থেকে এখনও মাস্টারমশাইকে সরিয়ে আনুন, আশকারা দিয়ে ওদের উনি মাথায় তুলেছেন।'

বললাম, 'আচ্ছা যান। দেখছি।'

ইয়ার ক্লোজিং-এর সময় কাজ সারতে সারতে রাত প্রায় আটটা হল। অফিসের আর সব ডিপার্টমেন্ট চলে গেছে। নিজের ডিপার্টমেন্টের দুজন সহকর্মীর সঙ্গো বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা যেতেই মনে পড়ল দেরাজটা চাবিবন্ধ করে আসিনি। কতকগুলি জরুরি চিঠি টেবিলেই আছে সহকর্মীদের ছেড়ে দিয়ে আমি ফের ঢুকলাম অফিসে। গেটের কাছে দারোয়ান খইনি টিপছে মাথা নীচু করে সেলাম জানাল।

দেরাজে চাবি বন্ধ করে ফিরে আসছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম অফিসের পূর্ব দক্ষিণ ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি আলো জ্বলছে। মৃদু আলাপ শোনা যাচ্ছে জনকয়েক বেয়ারাদের জনকয়েক অফিস বিল্ডিং-এই রাত্রে থাকে। ছাতের ওপর রান্নাবান্না করে, খায়দায় ভা বলাম তারাই আড্ডা দিচ্ছে।

ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ কানে গেল, 'আচ্ছা স্বাধীনতা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানো তোমার—' একি এ যে মাস্টারমশাইর গলা। এত রাত্রে মাস্টারমশাই কী করছেন এখানে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম সাত-আটটা ছোটো ছোটো টুল পেতে শীতল, বিপিন, নিবারণ, কানাই এবং আরও কয়েকজন মাস্টারমশাইকে প্রায় ঘিরে বসেছে। ডেসপ্যাচের চেয়ারটায় বসেছেন মাস্টারমশাই সবাইকে ছাড়িয়ে কাঁচা পাকা চুলে ভরতি তাঁর মাথাটা উঁচু হয়ে উঠেছে। বেয়ারাদের কারও হাতে খাতা পেনসিল, ব্যাংকেরই সব বাতিল কাগজপত্র। কারো হাতে খড়ি শ্লেট। আমাকে দেখেই মাস্টারমশাই আর ছাত্রের দল সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

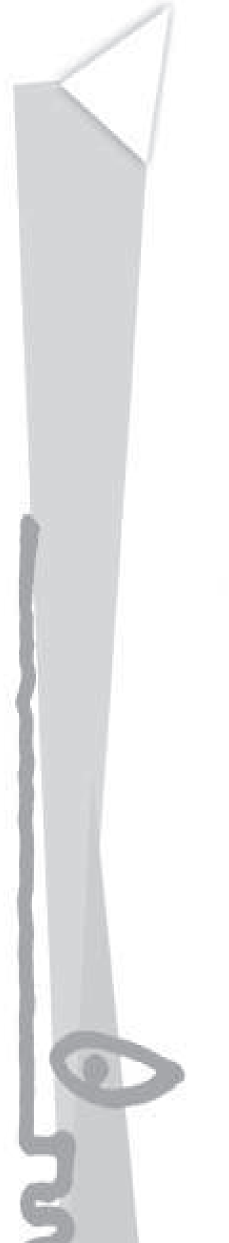

মুহূর্তকাল আমিও কোনো কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'এসব কী হচ্ছে মাস্টারমশাই। ক্লাস নিচ্ছেন না কি?'

মাস্টারমশাই অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর মতো উঠে দাঁড়ালেন, না না ক্লাস-টাস কিছু নয়। অমনিই ওদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। অফিস ডিসিপ্লিনটা ভালো করে আয়ত্ত করানোই অবশ্য আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্য আক্ষরিক শিক্ষাটাও কিছু কিছু দরকার, কী বল?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

মাস্টারমশাই বললেন, 'অদ্ভুত মাথা। ইংরেজি বল, অঙ্ক বল, সব বিষয়ে সমান উৎসাহ। এইসব ছেলেকে দিয়েই স্কলারশিপের অ্যাটেম্পট নিতে হয়। প্রায় ক্লাস সিক্সের স্ট্যান্ডার্ডে আছে। জান, খানিকটা কেয়ার নিতে পারলে ওকেও ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফার্স্ট করে তোলা যায়।

বেরিয়ে আসছিলাম, দেখি মাস্টারমশাই আমার পিছনে পিছনে এসেছেন। আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাস্টারমশাই বললেন, 'চল আমিও যাচ্ছি, একটা request নিরুপম এসব কথা যেন গীতার মা, কী জেনারেল ম্যানেজারের কানে না যায়।

মনে মনে হাসলাম, প্রথম মাস্টারিও মাস্টারমশাই এমনি লুকোচুরির ভিতরেই শুরু করেছিলেন।

মুকুট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

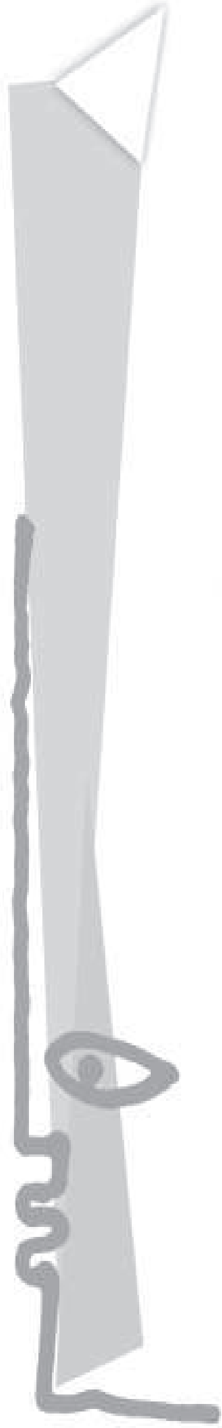

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ :

অমরমাণিক্য—মহারাজ
চন্দ্রমাণিক্য—যুবরাজ
ইন্দ্রকুমার—মধ্যম রাজকুমার
রাজধর—কনিষ্ঠ রাজকুমার
ধুরন্দর—ওই মামাতো ভাই
ইশা খাঁ—সেনাপতি
আরাকানরাজ
প্রতাপ
নিশানধারী ভাট, দূত, সৈনিক প্রভৃতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ত্রিপুরা সেনাপতি ইশা খাঁর কক্ষ
ত্রিপুরার কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর ও ইশা খাঁ
ইশা খাঁ অস্ত্র পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত

রাজধর : দেখো সেনাপতি, আমি বারবার বলছি তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ : তবে কী ধরে ডাকব? চুল ধরে না কান ধরে?

রাজধর : আমি বলে রাখছি, আমার সম্মান যদি তুমি না রাখ তোমার সম্মানও আমি রাখব না।

ইশা খাঁ : আমার সম্মান যদি তোমার হাতে থাকবার ভার থাকত তবে কানাকড়ার দরে তাকে হাটে বিকিয়ে আসতুম। নিজের সম্মান আমি নিজেই রাখতে পারব।

রাজধর : তাই যদি রাখতে চাও তা হলে ভবিষ্যতে আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ : বটে!

রাজধর : হাঁ।

ইশা খাঁ : হা হা হা হা ! মহারাজাধিরাজকে কী বলে ডাকতে হবে? হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা!

রাজধর : আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার সে কথা তুমি ভুলে যাও।

ইশা খাঁ : সহজে ভুলিনি, তুমি যে রাজকুমার সে কথা মনে রাখা শক্ত করে তুলেছ।

রাজধর : তুমি যে আমার ওস্তাদ, সে কথাও মনে রাখতে দিলে না দেখছি।

ইশা খাঁ : বস্ । চুপ।

দ্বিতীয় রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার : খাঁ সাহেব, ব্যাপারখানা কী?

ইশা খাঁ : শোনো তো বাবা। বড়ো তামাশার কথা। তোমাদের মধ্যে এই-যে ব্যক্তিটি সকলের কনিষ্ঠ এঁকে জাঁহাপনা শাহেনশা বলে না ডাকলে ওঁর সম্মান থাকে না—ওঁর সম্মানের এত টানাটানি!

ইন্দ্রকুমার : বল কী! সত্যি না কি হা হা হা হা!

রাজধর : চুপ করো দাদা।

ইন্দ্রকুমার : তোমাকে কী বলে ডাকতে হবে? জাঁহাপনা! হা হা হা হা— শাহেনশা!

রাজধর : দাদা, চুপ করো বলছি।

ইন্দ্রকুমার : জনাব, চুপ করে থাকা বড়ো শক্ত—হাসিতে যে পেট ফেটে যায় হুজুর।

রাজধর : তুমি অত্যন্ত নির্বোধ।

ইন্দ্রকুমার : ঠান্ডা হও ভাই, ঠান্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমারই থাক্, তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।

ইশা খাঁ : ওঁর বুদ্ধিটা সম্প্রতি বড়োই বেড়ে উঠেছে।

ইন্দ্রকুমার : নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না মই লাগাতে হবে।

অনুচরসহ যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য ও মাহারাজ অমরমাণিক্যের প্রবেশ

রাজধর : মহারাজের কাছে আমার নালিশ আছে।

মহারাজ : কী হয়েছে?

রাজধর : ইশা খাঁ পুনঃপুন নিষেধ সত্ত্বেও আমার অসম্মান করেন। এর বিচার করতে হবে।

ইশা খাঁ : অসম্মান কেউ করে না— অসম্মান তুমি করাও। আরও তো রাজকুমার আছেন, তাঁরাও মনে রাখেন আমি তাঁদের গুরু, আমিও মনে রাখি তাঁরা আমার ছাত্র—সম্মান-অসম্মানের কোনো কথাই ওঠে না।

মহারাজ : সেনাপতি সাহেব, কুমারদের এখন বয়স হয়েছে, এখন ওঁদের মান রক্ষা করে চলতে হবে বই-কি।

ইশা খাঁ : মহারাজ যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করেছেন তখন মহারাজকে যে-রকম সম্মান করেছি রাজকুমারদের তা অপেক্ষা কম করিনে।

রাজধর : অন্য কুমারদের কথা বলতে চাইনে, কিন্তু—

ইশা খাঁ : চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সঙ্গে কথা কচ্ছি। মহারাজ, মাপ করবেন, রাজবংশের এই কনিষ্ঠ পুত্রটি বড়ো হলে মুন্‌শির মতো কলম চালাতে পারবে, কিন্তু তলোয়ার এর হাতে শোভা পাবে না। (*যুবরাজ এবং ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া*) চেয়ে দেখুন মহারাজ, এঁরাই তো রাজপুত্র, রাজগৃহ আলো করে আছেন।

মহারাজ : রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলছেন! তুমি অস্ত্রশিক্ষায় ওঁকে সন্তুষ্ট করতে পারোনি?

রাজধর : সে আমার ভাগ্যের দোষ, অস্ত্রশিক্ষার দোষ নয়। মহারাজ নিজে আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, এই আমার প্রার্থনা।

মহারাজ : আচ্ছা, উত্তম। কাল আমাদের অবসর আছে, কালই পরীক্ষা হবে। তোমাদের মধ্যে যে জিতবে তাকে আমার এই হিরে-বাঁধানো তলোয়ার পুরস্কার দেব।

[প্রস্থান]

ইশা খাঁ : শাবাশ রাজধর শাবাশ! আজ তুমি ক্ষত্রিয়সন্তানের মতো কথা

বলেছ। অস্ত্র পরীক্ষায় যদি তুমি হার তাতেও তোমার গৌরব নষ্ট হবে না। হার-জিত তো আল্লার ইচ্ছা, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মনে স্পর্ধা থাকা চাই।

রাজধর : থাক্ সেনাপতি, তোমার বাহবা অন্য রাজকুমারদের জন্য জমা থাক্; এত দিন তা না পেয়েও যদি চলে গিয়ে থাকে তবে আজও আমার কাজ নেই।

যুবরাজ : রাগ করো না ভাই রাজধর। সেনাপতি সাহেবের সরল ভর্ৎসনা ওঁর সাদা দাড়ির মতো সমস্তই কেবল ওঁর মুখে। কোনো একটি গুণ দেখলেই তৎক্ষণাৎ উনি সব ভুলে যান। অস্ত্র পরীক্ষায় যদি তোমার জিত হয় তা হলে দেখবে, খাঁ সাহেব তোমাকে যেমন মনের সঙ্গো পুরস্কৃত করবেন এমন আর কেউ নয়।

রাজধর : দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে, আজ রাত্রে যখন গোমতী নদীতে বাঘে জল খেতে আসবে তখন শিকার করতে গেলে হয় না?

যুবরাজ : বেশ কথা। তোমাদের যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তো যাওয়া যাবে।

ইন্দ্রকুমার : কী আশ্চর্য! রাজধরের যে শিকারের প্রবৃত্তি হল! এমন তো কখনো দেখা যায়নি।

ইশা খাঁ : ওঁর আবার শিকারে প্রবৃত্তি নেই! উনি সকলের চেয়ে বড়ো জীব শিকার করে বেড়ান। রাজসভায় দুই-পা-ওয়ালা এমন একটি জীব নেই যিনি ওঁর কোনো-না কোনো ফাঁদে আটকা না পড়েছেন।

যুবরাজ : সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার জিহ্বাও তেমনি, দুই-ই খরধার— যার উপর গিয়ে পড়ে তার একেবারে মর্মচ্ছেদ না করে ফেরে না।

রাজধর : দাদা, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। খাঁ সাহেব জিহ্বায় যতই শান দিন-না কেন আমার মর্মে আঁচড় কাটতে পারবেন না।

ইশা খাঁ : তোমার মর্ম পায় কে বাবা! বড়ো শক্ত।

ইন্দ্রকুমার : যেমন, হঠাৎ আজ রাত্রে তোমার শিকারে যাবার শখ হল, এর মর্ম ভালো বোঝা যাচ্ছে না।

যুবরাজ : আহা, ইন্দ্রকুমার! প্রত্যেক কথাতেই রাজধরকে আঘাত করাটা তোমার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে!

রাজধর : সে আঘাতে বেদনা না পাওয়াও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

ইন্দ্রকুমার : দাদা, আজ রাত্রে শিকারে যাওয়াই তোমার মত না কি?

যুবরাজ : তোমার সঙ্গে, ভাই, শিকার করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। নিতান্ত নিরামিষ শিকার করতে হয়। তুমি বনে গিয়ে বড়ো বড়ো জন্তু মেরে আনো, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়ো কচু কাঁঠাল শিকার করেই মরি।

ইশা খাঁ : (*ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া*) যুবরাজ ঠিক বলেছেন পুত্র। তোমার তির সকলের আগে ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়ে লাগে—তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে কে!

ইন্দ্রকুমার : না দাদা, ঠাট্টা নয়। তুমি না গেলে কে শিকার করতে যাবে!

যুবরাজ : আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের ইচ্ছে হয়েছে, ওঁকে নিরাশ করব না।

ইন্দ্রকুমার : কেন দাদা, আমার ইচ্ছে হয়েছে বলে কি যেতে নেই?

যুবরাজ : সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই যাচ্ছি।

ইন্দ্রকুমার : তাই বুঝি পুরোনো হয়ে গেছে?

যুবরাজ : আমার কথা অমন উলটো বুঝলে বড়ো ব্যথা লাগে।

ইন্দ্রকুমার : না দাদা, ঠাট্টা করছিলুম—চলো প্রস্তুত হই গে।

ইশা খাঁ : ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সইতে পারে কিন্তু দাদার সামান্য অনাদরটুকু সইতে পারে না।

[*অনুচরগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান*]

অনুচরগণ

প্রথম : কথাটা তো ভালো ঠেকছে না হে। আমাদের ছোটোকুমারের ধনুর্বিদ্যার দৌড় তো সকলেরই জানা আছে।— উনি মধ্যমকুমারের সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষায় এগোতে চান এর মানে কী?

দ্বিতীয় : কেউ-বা তির দিয়ে লক্ষ্যভেদ করে, কেউ-বা বুদ্ধি দিয়ে।

প্রথম : সেই তো ভয়ের কথা। অস্ত্রপরীক্ষায় অস্ত্র না চালিয়ে যদি বুদ্ধি চালাও সেটা যে দুষ্টুবুদ্ধি।

তৃতীয় : দেখো বংশী, অস্ত্রই চলুক আর বুদ্ধিই চলুক মাঝের থেকে তোমার ওই জিভটিকে চালিয়ো না, আমার এই পরামর্শ। যদি টিকে থাকতে চাও তো চুপ করে থাকো।

দ্বিতীয় : বনমালী ঠিক কথাই বলেছে। ওই ছোটোকুমারের কথা উঠলেই তুমি যা মুখে আসে তাই বলে ফেল। রাজার ছেলে কে ভালো কে মন্দ সে বিচারের ভার আমাদের উপর নেই। তবে কি না

আমাদের যুবরাজ বেঁচে থাকুন আর আমাদের মধ্যমকুমার ভাই লক্ষ্মণের মতো সর্বদা তাঁর সঙ্গো সঙ্গো থেকে তাঁকে রক্ষে করুন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করো। ছোটোকুমারের কথা মুখে না আনাই ভালো।

প্রথম : ইচ্ছে করে তো আনিনে। আমাদের মধ্যমকুমার সরল মানুষ, মনে তাঁর ভয়-ডরও নেই, পাক-চক্রও নেই— সর্বদাই ভয় হয় ওই যাঁর নামটা করছিনে তিনি কখন তাঁকে কী ফেসাদে ফেলেন।

দ্বিতীয় : চল চল, ওই আসছেন।

প্রথম : ওই-যে সঙ্গো ওঁর মামাতো ভাই ধুরন্ধরটিও আছেন— শনির সঙ্গো মঙ্গাল এসে জুটেছেন।

[প্রস্থান]

রাজধর : অসহ্য হয়েছে।

ধুরন্ধর : কিন্তু সহ্য করতেও তো কসুর নেই। ইন্দ্রকুমারের সঙ্গো তো প্রায় জন্মাবধিই এইরকম চলছে, কিন্তু অসহ্য হয়েছে এমন তো লক্ষণ দেখিনে।

রাজধর : লক্ষণ দেখিয়ে লাভ হবে কি? য খন দেখাব একেবারে কাজে দেখাব। একটা সুযোগ এসেছে। এইবার অস্ত্রপরীক্ষায় আমি লক্ষ্যভেদ করব।

ধুরন্ধর : ইন্দ্রকুমারের বক্ষে নাকি?

রাজধর : বক্ষে নয়, তার হৃদয়ে। এবারকার পরীক্ষায় আমি জিতব, ওঁর অহংকারটাকে বিঁধে এফোঁড়-ওফোঁড় করব।

ধুরন্ধর : অস্ত্রপরীক্ষায় ইন্দ্রকুমারকে জিতবে এইটেকেই সুযোগ বলছ?

রাজধর : সুযোগ কি তিরের মুখে থাকে? সুযোগ বুদ্ধির ডগায়। তোমাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।

ধুরন্ধর : কাজ তো তোমার বরাবরই করে আসছি, ফল তো কিছু পাইনে।

রাজধর : ফলে সবুরে পাওয়া যায়। কোনোরকম ফন্দিতে ইন্দ্রকুমার-দাদার অস্ত্রশালায় ঢুকে তাঁর তূণের প্রথম খোপটি থেকে তাঁর নাম-লেখা তিরটি তুলে নিয়ে আমার নাম-লেখা তির বসিয়ে আসতে হবে। তার সঙ্গো আমার তির বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।

ধুরন্ধর : সবই যেন বুঝলুম কিন্তু আমার প্রাণটি? সেটি গেলে তো কারো সঙ্গে বদল চলবে না।

রাজধর : তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

ধুরন্ধর : তুমি তো বরাবরই আছ, কিন্তু ভয়ও আছে। সেই যখন ইন্দ্রকুমারের রুপোর পাত-দেওয়া ধনুকটার উপরে তুমি লোভ করলে আমিই তো সেটি সংগ্রহ করে তোমার ঘরে এনে লুকিয়ে রেখেছিলুম। শেষকালে যখন ধরা পড়লে ইন্দ্রকুমার ঘৃণা করে সে ধনুকটা তোমাকে দান করলেন, কিন্তু আমায় যে অপমানটা করলেন সে আমার জীবন গেলেও যাবে না। তখন তো ভাই, তুমি ছিলে, রক্ষা যত করেছিলে সে আমার মনে আছে।

রাজধর : এবার তোমার সময় এসেছে, সেই অপমানের শোধ দেবার জোগাড় করো।

ধুরন্ধর : সময় কখন কার আসে সেটা যে পরিষ্কার বোঝা যায় না। দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো; শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। ওই-যে ওঁরা সব আসছেন। আমি পালাই। তোমার সঙ্গে আমাকে একত্রে দেখলেই ইন্দ্রকুমার যে কথাগুলি বলবেন তাতে মধুবর্ষণ করবে না, আর ইশা খাঁও যে তোমার চেয়ে আমার প্রতি বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করবেন এমন ভরসা আমার নেই।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় দ্বারে

ইন্দ্রকুমার : কী হে প্রতাপ, ব্যাপারখানা কী? আমাকে হঠাৎ অস্ত্রশালায় দ্বারে যে ডাক পড়ল?

প্রতাপ : মধ্যম বউরানিমা আপনাকে খবর দিতে বললেন যে, আপনার অস্ত্রশালার মধ্যে একটি জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন, তিনি বায়ু-অস্ত্র না নাগপাশ না কী সেটা সন্ধান নেওয়া উচিত।

ইন্দ্রকুমার : বল কী প্রতাপ, কলিযুগেও এমন ব্যাপার ঘটে না কি?

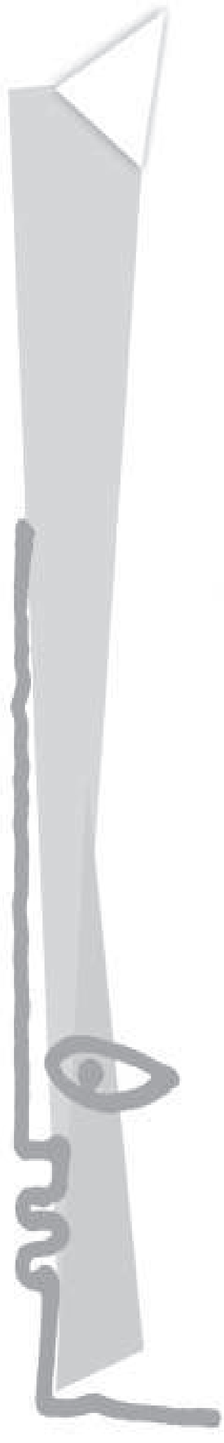

প্রতাপ : আজ্ঞে, কুমার, কলিযুগেই ঘটে, সত্যযুগে নয়। দরজাটা খুললেই সমস্ত বুঝতে পারবেন।

ইন্দ্রকুমার : তাই তো বটে, পায়ের শব্দ শুনি যে! (*দ্বার খুলিতেই রাজধরের নিষ্ক্রমণ*) এ কী! রাজধর যে! হা হা হা হা, তোমাকে অস্ত্র বলে কেউ ভুল করেছিল না কি! হা হা হা হা!

রাজধর : মেজোবউরানি তামাশা করে আমাকে এখানে বন্ধ করে রেখেছিলেন।

ইন্দ্রকুমার : এ ঘরটা তো সহজ তামাশার ঘর না—এখানকার তামাশা যে ভয়ংকর ধারালো তামাশা—এখানে তোমার আগমন হল যে!

রাজধর : আজ রাত্রে শিকারে যাব বলে অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে দেখলুম আমার অস্ত্রগুলোতে সব মরচে পড়ে রয়েছে। কালকের অস্ত্রপরীক্ষার জন্যে সেগুলিকে সমস্ত সাফ করতে দিয়ে এসেছি। তাই বউরানির কাছে এসেছিলুম তোমার কিছু অস্ত্র ধার নেবার জন্যে।

ইন্দ্রকুমার : তাই তিনি বুঝি সমস্ত অস্ত্রশালাসুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন! হা হা হা হা! তা বেরিয়ে এলে কেন? যাও, ঢুকে পড়ো। ধারের মেয়াদ ফুরিয়েছে না কি? হা হা হা হা!

রাজধর : হাসো, হাসো! এ তামাশায় আমিও হাসব। কিন্তু এখন নয়। চললুম দাদা, আজ আর শিকারে যাচ্ছিনে।

[প্রস্থান]

প্রতাপ : ছোটোকুমারকে নিয়ে আপনাদের এ-সমস্ত ঠাট্টা আমার ভালো বোধ হয় না।

ইন্দ্রকুমার : ঠাট্টা নিয়ে ভয় কীসের? উনিও ঠাট্টা করুন-না।

প্রতাপ : ওঁর ঠাট্টা বড়ো সহজ হবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

পরীক্ষাভূমি। রাজা, রাজকুমারগণ, ইশা খাঁ, নিশানধারী ও ভাট

ইন্দ্রকুমার : দাদা, আজ তোমাকে জিততেই হবে, নইলে চলবে না।

যুবরাজ : চলবে না তো কী? আমার তিরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জগৎসংসারে যেমন চলছিল ঠিক তেমনই চলবে। আর, যদিবা নাই চলত তবু

আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা দেখছিনে।

ইন্দ্রকুমার : দাদা, তুমি যদি হার তবে আমি ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।

যুবরাজ : না ভাই, ছেলেমানুষি করো না। ওস্তাদের নাম রাখতে হবে।

ইশা খাঁ : যুবরাজ, সময় হয়েছে—ধনুক গ্রহণ করো। মনোযোগ করো। দেখো, হাত ঠিক থাকে যেন।

যুবরাজের তির-নিক্ষেপ

ইশা খাঁ : যাঃ! ফসকে গেল!

যুবরাজ : মনোযোগ করেছিলুম খাঁ সাহেব, তিরযোগ করতেই পারলুম না।

ইন্দ্রকুমার : কখনো না। মন দিলে তুমি নিশ্চয়ই পারতে। দাদা, তুমি কেবল উদাসীন হয়ে সব জিনিস ঠেলে ফেলে দাও, এতে আমার ভারী কষ্ট হয়।

ইশা খাঁ : তোমার দাদার বুদ্ধি তিরের মুখে কেন খেলে না, তা জান? বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।

ইন্দ্রকুমার : সেনাপতি সাহেব তুমি অন্যায় বলছ।

ইশা খাঁ : (*রাজধরের প্রতি*) কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করো, মহারাজ দেখুন।

রাজধর : আগে দাদার হোক।

ইশা খাঁ : এখন উত্তর করবার সময় নয়, আমার আদেশ পালন করো।

রাজধরের তির-নিক্ষেপ

ইশা খাঁ : যাক্, তোমার তিরও তোমার দাদার তিরেরই অনুসরণ করছে— লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করেনি।

যুবরাজ : ভাই, তোমার বাণ অনেকটা নিকট দিয়েই গেছে, আর-একটু হলেও লক্ষ্যবিদ্ধ করতে পারত।

রাজধর : লক্ষ্যবিদ্ধ তো হয়েছে। দূর থেকে তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না। ওই-যে বিদ্ধ হয়েছে।

যুবরাজ : না রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে—লক্ষ্যবিদ্ধ হয়নি।

রাজধর : আমার ধনুর্বিদ্যার প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই বলেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না! আচ্ছা, কাছে গেলেই প্রমাণ হবে।

ইন্দ্রকুমারের ধনুক গ্রহণ

যুবরাজ : (*ইন্দ্রকুমারের প্রতি*) ভাই আমি অক্ষম, সেজন্য আমার উপর তোমার রাগ করা উচিত না। তুমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও তা হলে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে, এ তুমি নিশ্চয় জানো।

ইন্দ্রকুমারের তির-নিক্ষেপ

[*নেপথ্যে জনতা। জয় কুমার ইন্দ্রকুমারের জয়।*]

[*বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গান করিলেন।*]

ইশা খাঁ : পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো। মহারাজ, মধ্যমকুমার পুরস্কারের পাত্র। যেরূপ প্রতিশ্রুত আছেন তা পালন করুন।

রাজধর : না মহারাজ, পুরস্কার আমারই প্রাপ্য। আমারই তির লক্ষ্যভেদ করেছে।

মহারাজ : কখনোই না।

রাজধর : সেনাপতি সাহেব পরীক্ষা করে আসুন কার তির লক্ষ্যে বিঁধে আছে।

ইশা খাঁ : আচ্ছা, আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান]

[*তির হাতে লইয়া ইশা খাঁর পুনঃপ্রবেশ*]

ইশা খাঁ : (*ইন্দ্রকুমারের প্রতি*) বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, চোখে তো ভুল দেখছি নে। এই তিরের ফলায় যেন রাজধরের নাম দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্রকুমার : হাঁ, রাজধরেরই নাম।

মহারাজ : দেখি। তাই তো! একসঙ্গো আমাদের সকলেরই ভুল হল।

রাজধর : আজ নয় মহারাজ, আমার প্রতি বরাবরই ভুল হয়ে আসছে।

ইশা খাঁ : কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার : আমি বুঝেছি।

রাজধর : মহারাজ, আজ বিচার করুন।

ইন্দ্রকুমার : (*জনান্তিকে*) বিচার! তুমি বিচার চাও! তা হলে সে মুখে চুনকালি পড়বে। বংশের লজ্জা প্রকাশ করব না, অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।

ইশা খাঁ : কী হয়েছে বাবা? এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। শিলা কখনো

জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না। বাবা ইন্দ্রকুমার, ঠিক কথা বলো তো কী হয়েছে। তূণ বদল হয়নি তো?

রাজধর : কখনোই না পরীক্ষা করে দেখো।

ইশা খাঁ : তাই তো দেখছি— তূণ তো ঠিকই আছে। আচ্ছা, বাবা ইন্দ্রকুমার, সত্য করে বলো, এর মধ্যে তোমার অস্ত্রশালায় কেউ কি প্রবেশ করেছিল?

ইন্দ্রকুমার : সে কথায় প্রয়োজন নেই খাঁ সাহেব।

ইশা খাঁ : ঠিক করে বলো বাবা, তুমি নিশ্চয় জান কেউ তোমার অস্ত্রশালায় গিয়ে তোমার সঙ্গে তির বদল করেছে।

ইন্দ্রকুমার : চুপ করো খাঁ সাহেব। ও কথা থাক্।

ইশা খাঁ : তা হলে তুমি হার মানছ?

ইন্দ্রকুমার : হাঁ, আমি হার মানছি।

ইশা খাঁ : শাবাশ বাবা, শাবাশ! তুমি রাজার ছেলে বটে। মহারাজ, কোথাও একটা কিছু অন্যায় হয়ে গেছে, সে কথাটা প্রকাশ হচ্ছে না। আর-একবার পরীক্ষা না হলে ঠিকমতো মীমাংসা হতে পারবে না।

রাজধর : খাঁ সাহেব, অন্যায় আর কিছু নয়, আমার জেতাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আবার পরীক্ষার অপমান আমি স্বীকার করতে পারব না। আমার জিত হওয়া যদি অন্যায় হয়ে থাকে সে অন্যায়ের সহজ প্রতিকার আছে। আমি পুরস্কার চাইনে, মধ্যমকুমারকেই পুরস্কার দেওয়া হোক।

মহারাজ : সে কথা বলতে পারিনে—তিরে যখন তোমার নাম লেখা আছে তখন তোমাকে পুরস্কার দিতেই আমি বাধ্য। এই তুমি নাও।

[*তলোয়ার-প্রদান*]

রাজধর : পুরস্কার আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি, কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যে কারো মন যখন প্রসন্ন হচ্ছে না তখন এই তলোয়ার আমি দাদা ইন্দ্রকুমারকেই দিলুম।

[*ইন্দ্রকুমারের দিকে তলোয়ার অগ্রসর-করণ*]

ইন্দ্রকুমার : (*তলোয়ার মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া*) ধিক্! তোমার হাত থেকে এ

পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে কে?

ইশা খাঁ : (*ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া*) কী! ইন্দ্রকুমার, মহারাজের দত্ত তলোয়ার তুমি মাটিতে ফেলে দিতে সাহস করো! তোমার এই অপরাধের সমুচিত শাস্তি হওয়া চাই।

ইন্দ্রকুমার : (*হাত ছাড়াইয়া লইয়া*) বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করো না।

ইশা খাঁ : পুত্র, এ কী পুত্র! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছ।

ইন্দ্রকুমার : সেনাপতি-সাহেব, আমাকে ক্ষমা করো। আমি যথার্থই আত্মবিস্মৃত হয়েছি। আমাকে শাস্তি দাও।

যুবরাজ : ক্ষান্ত হও ভাই, ঘরে ফিরে চলো।

ইন্দ্রকুমার : (*মহারাজের পদধূলি লইয়া*) পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন। আজ সকল রকমেই আমার হার হয়েছে।

ইশা খাঁ : মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক। দেখা যাবে তাতে আপনার কোন্ পুত্র পুরস্কার আনতে পারে।

মহারাজ : কোন্ কাজের কথা বলছ সেনাপতি?

ইশা খাঁ : আরাকান-রাজের সঙ্গে মহারাজের যুদ্ধের মতলব আছে। সৈন্যও তো প্রস্তুত হয়েছে। এইবার কুমারদের সেই যুদ্ধে পাঠানো হোক।

মহারাজ : ভালো কথাই বলেছে সেনাপতি। খবর পেয়েছি আরাকানের রাজা চট্টগ্রামের সীমানার কাছে এসেছেন। বারবার শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু মূর্খের শিক্ষার শেষ তো কিছুতেই হয় না, যমরাজের পাঠশালায় না পাঠালে গতি নেই। কী বল বৎসগণ! আমাদের সেই চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা করে ক্ষাত্রচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজি আছ কি।

ইন্দ্রকুমার : আছি। দাদাও যাবেন।

রাজধর : আমিও যাব না মনে করছ না কি?

মহারাজ : তবে ইশা খাঁ, তুমি সৈন্যাধক্ষ হয়ে এঁদের সকলকে শত্রুবিজয়ে নিয়ে যাও। ত্রিপুরেশ্বরী তোমাদের সহায় হোন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজধরের শিবির। রাজধর ও ধুরন্ধর

ধুরন্ধর : তুমি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তফাতে থাকবে না কি?

রাজধর : হাঁ—ইশা খাঁর কাছে আমি এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলুম।

ধুরন্ধর : সে তো অমি জানি; আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলুম, তাই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়ে গেল।

রাজধর : কীরকম?

ধুরন্ধর : প্রথমেই তো ইন্দ্রকুমার অট্টহাস্য করে উঠলেন। তিনি বললেন, রাজধরের যুদ্ধপ্রণালীটাই ওইরকম—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে থেকেই তিনি যুদ্ধ করতে ভালোবাসেন।

রাজধর : সে কথা ঠিক। ক্ষেত্রে থেকে যুদ্ধ করে মজুররা, দূরে থেকে যে যুদ্ধ করতে পারে সেই যোদ্ধা। ইশা খাঁ কী বললেন?

ধুরন্ধর : তোমার উপর তাঁর বিশ্বাস কীরকম সে তো তুমি জানই— তুমি যদি পায়ে ধরতে যাও তা হলেও তিনি সন্দেহ করেন নিশ্চয় জুতোজোড়াটা তোমার সরাবার মতলব আছে। তাই ইশা খাঁ বললেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধর তফাতে থাকতে চান সেটা তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়, কিন্তু পাঁচ হাজার সৈন্য সঙ্গে রাখতে চান সেইটে আমার ভালো ঠেকছে না।

রাজধর : যুবরাজ কিছু বললেন না?

ধুরন্ধর : যুবরাজ কাউকে যে সন্দেহ করবেন সে পরিমাণ বুদ্ধি ভগবান তাঁকে দেননি— এমনকি, তুমি যে তুমি, তোমার উপরেও তাঁর সন্দেহ হয় না।

রাজধর : দেখো, ধুরন্ধর, দাদার কথা তুমি অমন করে বোলো না!

ধুরন্ধর : ওঃ, ওই জায়গাটা তোমার একটু নরম আছে সেটা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। যা হোক, তিনি বললেন, না, না, রাজধরের প্রতি তোমারা অন্যায় অবিচার করছ, তাঁর প্রস্তাবটা তো আমার ভালোই ঠেকেছে। যুদ্ধে যদি সংকট উপস্থিত হয় তা হলে তিনি তাঁর সৈন্য নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। যুবরাজের অনুরোধেই তো

ইশা খাঁ তোমার প্রস্তাবে রাজি হলেন, নইলে তাঁর বড়ো ইচ্ছে ছিল না। যাই হোক, কিন্তু আমি তোমার আলাদা থাকবার মতলব ভালো বুঝতে পারছিনে।

রাজধর : ওঁদের সঙ্গে একত্রে মিলে যুদ্ধ করে আমার লাভ কী? জিত হলে সে জিতকে কেউ আমার জিত বলবে না তো।

ধুরন্ধর : তবু ভুলেও কেউ তোমার নাম করতে পারে, কিন্তু তফাতে বসে থাকলে যুদ্ধে জয় হলেও তোমার অপযশ, হারলে তো কথাই নেই।

রাজধর : আমার এই পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়েই আমি যুদ্ধে জিতব এবং আমি একলাই জিতব।

দূতের প্রবেশ

রাজধর : কী রে, যুদ্ধের খবর কী?

দূত : আজ্ঞে লড়াই তো সমস্ত দিন ধরেই চলছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এঁরা শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করতে পারেননি। সূর্য অস্ত যাওয়ার আর তো বেশি দেরি নেই—অন্ধকার হয়ে এলে বোধহয় যুদ্ধ আজকের মতো বন্ধ রাখতে হবে।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

রাজধর : কে তুমি?

দ্বিতীয় দূত : আজ্ঞে আমি ব্যোমকেশ। যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—সেও প্রায় দুই প্রহর হয়ে গেল। আপনার যেখানে সৈন্য নিয়ে থাকবার কথা ছিল সেখানে কোনো চিহ্ন না পেয়ে বহু সন্ধানে এখানে এসেছি।

রাজধর : যুবরাজের আদেশ কী?

দূত : শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আমরা যেরকম অনুমান করেছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে—যুদ্ধ খুব কঠিন হয়ে এসেছে। কুমার ইন্দ্রকুমার তাঁর অশ্বরোহীদল নিয়ে শত্রুসৈন্যের উত্তর দিক আক্রমণ করেছিলেন, আর কিছুক্ষণ সময় পেলেই তিনি সে দিক থেকে শত্রুসৈন্যকে একেবারে নদীর কিনারা পর্যন্ত হঠিয়ে আনতে পারতেন।

রাজধর : সত্যি নাকি! সময় পেলে কী করতে পারতেন সে কথা কল্পনা করে বিশেষ লাভ দেখিনে—কিন্তু সময় পাননি বলেই বোধ হচ্ছে।

দূত : শত্রুসৈন্যকে যখন প্রায় টলিয়ে এনেছেন এমন সময় খবর পেলেন যে যুবরাজ সংকটে পড়েছেন, শত্রু তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। ইশা খাঁ তখন অন্যদিকে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি খবর পেয়ে বললেন, যুবরাজকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি এখানে আসিনি, আমাকে যুদ্ধে জিততে হবে; আমি এখান থেকে নড়তে গেলেই শত্রুরা সুবিধা পাবে।

রাজধর : দাদা, কি তবে—

দূত : না, তাঁর কোনো বিপদ এখনও ঘটেনি। ইন্দ্রকুমার সৈন্য নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এই গোলেমালে যুদ্ধে আমাদের অসুবিধা ঘটল। আপনাকে সন্ধান করবার জন্যে নানা দিকে দূত গিয়েছে— আপনার সাহায্য না হলে বিপদ ঘটতেও পারে, অতএব আপনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব করবেন না।

রাজধর : না, কিছুমাত্র বিলম্ব করব না। যাও, তুমি বিশ্রাম করো গে যাও—আমি প্রস্তুত হচ্ছি।

[দূতের প্রস্থান]

ধুরন্ধর : তুমি যাচ্ছ না কি?

রাজধর : যাচ্ছি বটে, কিন্তু ও দিকে নয়, অন্য দিকে।

ধুরন্ধর : বাড়ির দিকে?

রাজধর : তুমিও কি ইশা খাঁর কাছ থেকে বিদ্রুপ অভ্যেস করেছ! বীরত্ব যাঁর খুশি তিনি দেখান, কিন্তু যুদ্ধে জয় করে যদি কেউ বাড়ি ফেরে তো সে রাজধর। ধুরন্ধর, যাও তুমি— দেখো গে আমার শিবিরে কোথাও যেন কেউ আগুন না জ্বালে। একটি প্রদীপও যেন না জ্বলতে পায়।

ধুরন্ধর : আচ্ছা, আমি সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি— কিন্তু কী তোমার অভিপ্রায় খুলেই বলো না। তুমি যদি আমাকে আর আমি যদি তোমাকে সন্দেহ করি তা হলে পৃথিবীতে আমাদের দুটির তো কোথাও ভর দেওয়ার জায়গা থাকবে না।

রাজধর : আজ রাত্রের অন্ধকারে আমি সৈন্য নিয়ে গোপনে নদী পার হয়ে

যাব। হঠাৎ আরাকানরাজের শিবিরে উপস্থিত হয়ে তাকে বন্দি করবে হবে।

ধুরন্ধর : এখানে কোথায় পার হবে, ঘাট তো নেই।

রাজধর : পথঘাট আমি সমস্তই সন্ধান করে ঠিক করে রেখেছি। সূর্য তো অস্ত গেল। আজ আড়াই প্রহর রাত্রে চাঁদ উঠবে, তার পূর্বেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। অতএব আর বড়ো বেশি দেরি নেই—তুমি যাও, প্রস্তুত হও গে। আর একটি কাজ করো—যুবরাজের দূত যেন ফিরে যেতে না পারে, তাকে বন্দি করে রাখো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইশা খাঁর শিবির

ইন্দ্রকুমার ও ইশা খাঁ

ইন্দ্রকুমার : সেনাপতি-সাহেব, আপনি দাদার উপর রাগ করবেন না। আজ রাত্রে সৈন্যেরা বিশ্রাম করুক, কাল আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করব।

ইশা খাঁ : দেখো ইন্দ্রকুমার, আগুন যত শীঘ্র নেবানো যায় ততই মঙ্গল—তাকে সময় দিলে কীসের থেকে কী ঘটে কিছুই বলা যায় না। আজই আমরা জিতে আসতুম—কেবল তোমার দাদা নিতান্ত নির্বোধের মতো শত্রুদের মাঝখানে নিজেকে খামকা জড়িয়ে বসলেন, আমাদের সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল।

ইন্দ্রকুমার : নির্বোধের মতো কেন বলছ খাঁ সাহেব, বলো বীরের মতো—তিনি সামান্য কয়জন সৈন্য নিয়ে—

ইশা খাঁ : যেখানে গিয়ে পড়েছিলেন সেখানে কেবল নির্বোধই যেতে পারে—

ইন্দ্রকুমার : (*উত্তেজিত স্বরে*) না, সেখানে বীর না হলে কেউ প্রবেশ করতে সাহস করতে পারে না।

ইশা খাঁ : আচ্ছা বাবা, তোমার কথা মানছি। কিন্তু শুধু বীর নয়, নির্বোধ বীর না হলে সে দিকে কেউ যেত না।

ইন্দ্রকুমার : কিন্তু তাতে তোমার লড়াইয়ের তো কোনো ব্যাঘাত হয়নি।

ইশা খাঁ : খুব ব্যাঘাত হয়েছিল। আমার সৈন্যেরা খবর পেয়ে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল, তাদের কি আর লড়াইয়ে মন ছিল? আমাদের সৈন্যের মধ্যে একজনও নেই যুবরাজের বিপদের খবর শুনে যে

স্থির থাকতে পারে।

ইন্দ্রকুমার : কিন্তু সেনাপতি-সাহেব, আমাদের রাজধরের খবর কী?

ইশা খাঁ : আমি চারদিকেই দূত পাঠিয়েছিলুম, একজন ছাড়া সব দূতই ফিরে এসেছে— কোথাও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার : তা কী কবর, সেনাপতি-সাহেব, আমি খুশি হয়েছি। আমরা যুদ্ধ করে মরতুম আর ও যে আমাদের খ্যাতিতে ভাগ বসাত সে আমার কিছুতেই সহ্য হত না; তার চেয়ে ও ভেগে গেছে সে ভালোই হয়েছে। এবারকার অস্ত্রপরীক্ষায় তো ফাঁকি চলবে না।

ইশা খাঁ : কিন্তু সেবার কী হয়েছিল তুমি আমার কাছে বলনি।

ইন্দ্রকুমার : সে বলবার কথা না খাঁ সাহেব— সে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না সেবার আমি হেরেছিলুম।

ইশা খাঁ : তির ছুড়ে হারনি বাবা, রাগ করে হেরেছিলে।

তৃতীয় দৃশ্য

আরাকান-রাজের শিবির

আরাকান-রাজ ও রাজধর

আরাকান-রাজ : দেখুন রাজকুমার, আমাকে বন্দি করে আপনাদের কোনো লাভ নেই।

রাজধর : কেন লাভ নেই রাজন্? এই যুদ্ধের মধ্যে আপনাকে লাভ করাই তো সব চেয়ে বড়ো লাভ।

আরাকান-রাজ : তাতে যুদ্ধের অবসান হবে না। আমার ভাই হামচু রয়েছে, সৈন্যেরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।

রাজধর : আপনাকে মুক্তিই দেব, কিন্তু সেটা তো একেবারে বিনামূল্যে দেওয়া চলবে না।

আরাকান-রাজ : সে আমি জানি, মূল্য দিতে হবে। আমি আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করে সন্ধিপত্র লিখে দিতে রাজি আছি।

রাজধর : শুধু সন্ধিপত্র দিলে তো হবে না মাহারাজ। আপনি যে পরাজয় স্বীকার করলেন তার কিছু নিদর্শন তো দেশে নিয়ে যেতে হবে।

আরাকান-রাজ : আপনাকে পাঁচশত ব্রহ্মদেশের ঘোড়া ও তিনটি হাতি উপহার দেব।

রাজধর : সে উপহারে আমার প্রয়োজন নেই—মহারাজের মাথার মুকুট আমাকে দিতে হবে।

আরাকান-রাজ : তার চেয়ে প্রাণ দেওয়া সহজ ছিল।

রাজধর : প্রাণ দিলেও মুকুটটি তো বাঁচাতে পারবেন না, মাঝের থেকে প্রাণটাই বৃথা যাবে।

আরাকান-রাজ : তবে মুকুট নিন, কিন্তু এই মুকুটের সহিত আরাকানের চিরস্থায়ী শত্রুতা আপনি ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মুকুট যতদিন না আবার ফিরে পাব ততদিন আমার রাজবংশে শান্তি থাকবে না।

রাজধর : এই তো রাজার মতো কথা। আমারাও তো শান্তি চাইনে মহারাজ, আমরা ক্ষত্রিয়। আর-একটি কর্তব্য বাকি আছে। শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করে এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠিয়ে দিন ওপারে এতক্ষণ যুদ্ধের উদ্যোগ হচ্ছে।

আরাকান-রাজ : এখনই আমার আদেশ নিয়ে দূত যাবে।

রাজধর : তবে চলুন, সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করা যাক।

চতুর্থ দৃশ্য

রণক্ষেত্র

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার

যুবরাজ : আজকের যুদ্ধে গতিকটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে আমাদের সৈন্যেরা কালকের ব্যাপারে আজও নিরুৎসাহ হয়ে রয়েছে—ওরা যেন ভালো করে লড়ছে না। ইশা খাঁ কোন্ দিকে?

ইন্দ্রকুমার : ওই-যে পূর্বকোণে তাঁর নিশান দেখা যাচ্ছে।

যুবরাজ : ভাই, তুমি কেন আজ আমার সঙ্গে রয়েছ? তোমার বোধহয় ওই উত্তরের দিকে যাওয়াই কর্তব্য।

ইন্দ্রকুমার : না, আমার এই জায়গাই ভালো।

যুবরাজ : ইন্দ্রকুমার, তুমি তোমার দাদাকে আজ নির্বুদ্ধিতা থেকে বাঁচাবার জন্যে সতর্ক হয়ে কাছে কাছে ফিরছ। খাঁ সাহেব যে আবার কোনো সুযোগে আমরা বুদ্ধির দোষ ধরবেন এটা তোমার ভালো লাগছে

না। কিন্তু ভাই, আমারও নির্বুদ্ধিতার সীমা আছে—আমি আজ বোধহয় সাবধানে কাজ করতে পারব। ওই দেখো, চেয়ে দেখো, আমার কিন্তু ভালো বোধ হচ্ছে না। ওই দেখো, ওই পাশে আমাদের সৈন্যেরা যেন টলছে। এখনই পালাতে আরম্ভ করবে—তুমি না হলে কেউ ওদের ঠেকাতে পারবে না। ইন্দ্রকুমার, দেরি করো না, আমার জন্যে তোমার ভয় নেই। একি! একি! একি!

ইন্দ্রকুমার : তাই তো, একি! শত্রুসৈন্যেরা হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ করলে যেন!

যুবরাজ : ওই-যে সন্ধির নিশান উড়িয়েছে! ওদের তো পরাজয়ের কোনো লক্ষণ ছিল না, তবে কেন এমন ঘটল। আমার তো মনে হচ্ছিল আজকের যুদ্ধে আমাদের সৈন্যেরাই টলমল করছে।

দূতের প্রবেশ

দূত : যুবরাজ, শত্রুপক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়েছে।

যুবরাজ : সে তো দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ কী?

দূত : কারণ এখনও জানতে পারিনি, কিন্তু শুনতে পেয়েছি, আরাকান-রাজ আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে করবেন না বলে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

যুবরাজ : সুসংবাদ। আমার কেবল মনে একটি বেদনা বাজছে।

ইন্দ্রকুমার : কীসের বেদনা, দাদা?

যুবরাজ : রাজধর কেন সৈন্য নিয়ে চলে গেল। সে যদি থাকত তা হলে কী আনন্দের সঙ্গে আমরা তিন ভাই জয়োৎসব করতে পারতুম। আজকের আমাদের জয়গৌরবের মধ্যে এই একটি মস্ত অভাব রয়ে গেল—রাজধর যুদ্ধে যোগ না দিয়ে আমাকে বড়ো দুঃখ দিয়েছে।

ইন্দ্রকুমার : জয়ের ভাগ না দিয়েই সে যদি পালিয়ে থাকে তাতে এমনি কী ক্ষতি হয়েছে দাদা!

যুবরাজ : না ভাই, আমরা তিন ভাই একত্রে বেরিয়েছি, বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ আমরা ভাগ করে ভোগ না করতে পারলে আমার তো মনে দুঃখ থেকে যাবে। রাজধর যদি মাথা হেঁট করে বাড়ি ফেরে, আমাদের সৌভাগ্যে যদি তার মুখ বিমর্ষ হয়, তা হলে এই কীর্তি আমাকে কিছুমাত্র সুখ দেবে না।—ওই-যে ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতি-সাহেব আসছেন।

ইশা খাঁর প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার : খাঁ সাহেব, শত্রুসৈন্য হঠাৎ থামিয়ে দিলে কেন তার কোনো খবর পেয়েছ?

ইশা খাঁ : পেয়েছি বই-কি। রাজধর আরাকান-রাজাকে বন্দি করেছে।

ইন্দ্রকুমার : রাজধর! মিথ্যা কথা!

ইশা খাঁ : যা মিথ্যা হওয়া উচিত ছিল এক-এক সময় তাও সত্য হয়ে ওঠে। আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লার দূতেরা এক-এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, শয়তান তখন সমস্ত হিসাব উলটো করে দিয়ে যায়।

ইন্দ্রকুমার : শয়তানও কি রাজধরকে জিতিয়ে দিতে পারে!

ইশা খাঁ : একবার তো জিতিয়েছিল সেই অস্ত্রপরীক্ষার সময়—এবারও সেই শয়তান জিতিয়েছে।

যুবরাজ : সেনাপতি-সাহেব, তুমি রাজধরের উপর রাগ করো না! সে যদি জিতে থাকে তাতে তো আমাদেরই জিত। কখন সে যুদ্ধ করলে, কখন বা বন্দি করলে, আমরা তো জানতে পারিনি।

ইশা খাঁ : কাল সন্ধ্যার পরে আমরা যখন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে শিবিরে ফিরে এলেম তখন সে অন্ধকারে গোপনে নদী পার হয়ে হঠাৎ আরাকান-রাজের শিবির আক্রমণ করে তাঁকে বন্দি করেছে। আমাদের সাহায্য করবার জন্যে আমি তাকে যেখানে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলুম সেখানে সে ছিলই না। আমি সেনাপতি, আমার আদেশ সে মান্যই করেনি।

ইন্দ্রকুমার : অসহ্য! এজন্যে তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

ইশা খাঁ : শুধু তাই! যুবরাজ উপস্থিত থাকতে সে কি না নিজের ইচ্ছামতো সন্ধিপত্র রচনা করেছে।

ইন্দ্রকুমার : এর শাস্তি না দিলে অন্যায় হবে।

ইশা খাঁ : তোমরা দাদাকে এই সহজ কথাটি বুঝিয়ে দাও দেখি।

রাজধরের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার : রাজধর! তুমি কাপুরুষতা প্রকাশ করেছ।

রাজধর : তোমার মতো যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পুরুষকার প্রকাশ করতে আমি এত দূরে আসিনি—আমি যুদ্ধ জয় করতে এসেছিলুম।

ইন্দ্রকুমার : তুমি যুদ্ধ করেছ! এবং জয় করেছ! জয়লক্ষ্মীর মুখ যে লজ্জায় লাল করে তুলেছ!

রাজধর : তা হতে পারে, সেটা প্রণয়ের লজ্জা। কিন্তু তিনি যে আমাকে বরণ করেছেন তার সাক্ষী এই।

ইন্দ্রকুমার : এ মুকুট কার?

রাজধর : এ মুকুট আমার। এ আমার জয়ের পুরস্কার।

ইন্দ্রকুমার : যুদ্ধ থেকে পালিয়েছ তুমি—তুমি পুরস্কার পাবে কীসের! এ মুকুট যুবরাজ পরবেন।

রাজধর : আমি জিতে এনেছি, আমিই পরব।

যুবরাজ : রাজধর ঠিক কথাই বলেছেন। ওঁর জয়ের ধন তো উনিই পরবেন।

ইশা খাঁ : সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করে উনি অন্ধকারে শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করলেন—আর উনি পরবেন মুকুট! ভাঙা হাঁড়ির কানা পরে যদি দেশে যান তবেই ওঁকে সাজবে।

রাজধর : আমি যদি না থাকতুম ভাঙা হাঁড়ির কানা তোমাদের পরতে হত। এতক্ষণ থাকতে কোথায়!

ইন্দ্রকুমার : যেখানেই থাকি তোমার মতো পালিয়ে থাকতুম না।

যুবরাজ : ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলছ ভাই। সত্য বলতে কী, রাজধর না থাকলে আজ আমাদের বিপদ হত।

ইন্দ্রকুমার : কিচ্ছু বিপদ হত না। রাজধর সৈন্য লুকিয়ে রেখেই আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। রাজধর না থাকলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করে আনতুম। রাজধর চুরি করে এনেছে। দাদা, এ মুকুট এনে আমি তোমাকেই পরাতুম, নিজে পরতুম না।

যুবরাজ : (*রাজধরের প্রতি*) ভাই, তুমিই আজ জিতেছে। তুমি না থাকলে অল্প সৈন্য নিয়ে আমাদের কী বিপদ হত বলা যায় না। এ মুকুট আমি তোমাকেই পরিয়ে দিচ্ছি।

ইন্দ্রকুমার : (*রুদ্ধকণ্ঠে*) রাজধর ক্ষাত্রধর্ম লঙ্ঘন করেছে বলে তোমার কাছ থেকে আজ পুরস্কার পেলে— আর আমি যে প্রাণকে তুচ্ছ করে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলুম, তোমার মুখ থেকে একটা প্রশংসার কথাও শুনতে পেলুম না! এমন কথা তোমার মুখ থেকে আজ শুনতে হল যে, রাজধর না থাকলে কেউ তোমাকে বিপদ

হতে উদ্ধার করতে পারত না! কেন দাদা, আমি কি প্রত্যুষ থেকে আর সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করিনি! আমি কি রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিলুম! আমি কি শত্রুসৈন্যের বেষ্টন ছিন্ন করে তোমার সাহায্যের জন্যে আসিনি! কী দেখে তুমি বললে তোমার স্নেহের রাজধর ছাড়া কেউ তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারত না!

যুবরাজ : ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলছি নে।

ইন্দ্রকুমার : থাক্ দাদা, থাক্। আর কিছুই বলতে হবে না। রাজধরের মতো এমন অসাধারণ বীরকে যখন তুমি সহায় পেয়েছ তখন আমার আর প্রয়োজন নেই—আমি চললেম।

যুবরাজ : ভাই, আবার! আবার তুমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছ!

ইন্দ্রকুমার : যেখানে আমার প্রয়োজন নেই সেখানে আমার পক্ষে থাকাই অপমান।

[প্রস্থান]

ইশা খাঁ : যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাউকে দেওয়ার অধিকার নেই। আমি সেনাপতি, আমি যাকে দেব এ তারই হবে।

[রাজধরের মাথা হইতে মুকুট লইয়া যুবরাজকে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন]

যুবরাজ : (*সরিয়া গিয়া*) না, এ মুকুট আমি নিতে পারিনে।

ইশা খাঁ : তবে থাক। এ মুকুট কেউ পাবে না। এ কর্ণফুলির জলে যাক। (*মুকুট নিক্ষেপ*) রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন উনি শাস্তির যোগ্য।

রাজধর : দাদা, তুমি সাক্ষী রইলে। এ আমি ভুলব না।

যুবরাজ : এইটেই কি সকলের চেয়ে মনে রাখবার কথা! মুকুটটাও যদি জলে গিয়ে থাকে তবে ওর সমস্ত লাঞ্ছনাও যাক। তোমরাও যা ভোলবার ভোলো, আমাদেরও যা ভোলবার ভুলে যাই। দেখি, ইন্দ্রকুমার সত্যই রাগ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেল কি না।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির

রাজধর ও ধুরন্ধর

রাজধর : ধুরন্ধর, আমার মুকুট যেখানে গিয়েছে আমাদের যুদ্ধজয়কেও সেই কর্ণফুলির জলে জলাঞ্জলি দেব।

ধুরন্ধর : আবার হারবে না কি?

রাজধর : হ্যাঁ, এবার হেরে জিতব। ইন্দ্রকুমারের অহংকারকে ধুলোয় না লুটিয়ে দিয়ে আমি ফিরব না। আমার হাতের জিতকে তিনি গ্রহণ করবেন না! দেখি, এবার নিজে তিনি কেমন জিততে পারেন।

ধুরন্ধর : অত বেশি নিশ্চিন্ত হোয়ো না—দৈবাৎ জিতে যেতেও পারে। সত্যি কথায় রাগ করলে চলবে না, যুদ্ধবিদ্যাটা ইন্দ্রকুমার একটু শিখেছে।

রাজধর : আচ্ছা, সে-সব তর্ক পরে হবে। এখন তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আরাকান-রাজসৈন্য নিয়ে কাল প্রাতেই যাত্রা করবেন। কথা আছে যতদিন না তিনি চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে যাবেন ততদিন তাঁর সেনাপতিরা আমার শিবিরে বন্দি থাকবেন। তিনি শিবির তোলবার পূর্বেই আজ রাত্রে গোপনে তাঁর কাছে তুমি আমার এই চিঠিখানি নিয়ে যাবে।

ধুরন্ধর : চিঠিতে কী আছে সেটা তো আমার জানা ভালো। কেন-না যদি দুটো-একটা কথা বলবার দরকার হয় তা হলে বলে কাজটা চুকিয়ে আসতে পারব।

রাজধর : আমি লিখেছি আমি অপমানিত হয়েছি, এইজন্য আমার ভাইদের কাছ থেকে আমি অবসর নিলুম। আমার পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি গৃহে ফেরবার ছলে দূরে চলে যাব। ইন্দ্রকুমারও দাদার উপর অভিমান করে চলে গেছে। সৈন্যরাও যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে জেনে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে—এই অবকাশে যদি আরাকান-রাজ সহসা আক্রমণ করেন তা হলে ত্রিপুরার সৈন্যদের নিশ্চয় হার হবে।

ধুরন্ধর : হার তো হবে। তারপরে? তুমি-সুদ্ধ শেষে হায় হায় করে মরবে না তো! আগুন যদি লাগাতে হয় তো নিজের ঘরের চালটা সামলে লাগাতে হবে।

রাজধর : আমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে আর-কারো বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না। তুমি প্রস্তুত হও গে—দেখো, কেউ যেন জানতে না পারে। আমার সৈন্যরা যদি কোনোমতে সন্দেহ করে তা হলে সমস্তই পণ্ড হবে।

ধুরন্ধর : দেখো রাজধর, আমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যেও আর-কারো বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রণক্ষেত্র

ইশা খাঁ ও যুবরাজ

ইশা খাঁ : যুবরাজ, আল্লাকে স্মরণ করো। আজ বড়ো শক্ত সময় এসেছে।

যুবরাজ : শক্তটা কীসের, খাঁ সাহেব! ভগবানের যখন ইচ্ছা হয় তখন মরাও শক্ত নয়, বাঁচাও শক্ত নয়—সবই সহজ।

ইশা খাঁ : মহারাজ আমার হাতে তোমাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেইজন্যেই মনে আক্ষেপ হচ্ছে; নইলে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু তো বিবাহশয্যায় নিদ্রা। যুবরাজ, তুমি পালাবার চেষ্টা করো—যুদ্ধের ভার আমার উপর রইল।

যুবরাজ : তুমি আমাদের অস্ত্রগুরু, তোমার মুখে এ উপদেশ সাজে না। তা ছাড়া পথই বা কোথায়? আর মরবার যেমন চমৎকার সুযোগ হয়েছে পালাবার তেমন নয়।

ইশা খাঁ : কিন্তু বাবা, মনের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে। ইন্দ্রকুমার যে অভিমান করে দূরে চলে গেল, তার এই অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্যে আমি হয়তো বেঁচে থাকব না।

যুবরাজ : যদি বেঁচে না থাক সেনাপতি, তা হলে তার শাস্তি আরও ঢের বেশি হবে। সে যে তোমাকে পিতার মতো জানে।

ইশা খাঁ : আল্লা! সে কথা সত্য। বাবা, আজ বুঝছি আমার সময় হবে না। কিন্তু যদি তোমার সুযোগ হয় তবে তাকে বোলো, যদি ইশা খাঁ বেঁচে থাকত তবে তাকে শাস্তি দিত কিন্তু, মরবার আগে তাকে ক্ষমা করে মরেছে। বাস্, আর সময় নেই—চললুম বাবা। এসো, একবার আলিঙ্গন করে যাই। আল্লার হাতে দিয়ে গেলুম, তিনি

তোমাকে রক্ষা করবেন।

যুবরাজ : খাঁ সাহেব, কতদিন কত অপরাধ করেছি, আজ সমস্ত মার্জনা করে যাও।

ইশা খাঁ : বাবা, জন্মকাল থেকে তোমাকে দেখছি, কোনোদিন কোনো অপরাধ তুমি জমতে দাওনি, হাতে হাতে সমস্তই নিকাশ করে দিয়েছ— আজ মার্জনা করব এমন তো কিছুই রাখনি। তোমার নির্মল প্রাণ আজ আল্লা যদি নেন তবে তাঁর স্বর্গোদ্যানের কোনো ফুলের কাছেই সে ম্লান হবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

রণক্ষেত্র

ইশা খাঁ ও যুবরাজ

প্রথম সৈনিক : এ কি সত্যি

দ্বিতীয় সৈনিক : কী জানি ভাই, শুনছি তো।

প্রথম : তবে তো সর্বনাশ হবে।

[দ্রুত প্রস্থান]

দ্বিতীয় দলের প্রবেশ

প্রথম : কে বললে রে, কে বললে?

দ্বিতীয় : আমাদের উমেশ বললে?

প্রথম : কী জানি ভাই শুনে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হল, ভালো করে সব কথা জিজ্ঞেস করতে পারলুম না।

দ্বিতীয় : চল, ভালো করে খোঁজ করে আসি গে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দলের প্রবেশ

প্রথম : আমারা তাঁর হাতিকে দেখেছি। হাওদা খালি, মাহুত নেই। প্রভুকে হারিয়ে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় : আমাদেরও যে সেই দশা হয়েছে।

তৃতীয় : কোন্ দিকে পড়েছেন কেউ দেখেনি?

দ্বিতীয় : আমাদের শিবু বলছিল, যুবরাজের যখন বাণ এসে লাগল তখন মাহুত তাঁর হাতি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিল, পালাবার সময় মাহুত মারা যায়— তারপরে যুবরাজ যে সেই হাতির উপর থেকে কোন্‌খানে পড়ে গিয়েছেন তা তো কেউ বলতে পারে না।

আর-এক দলের প্রবেশ

চতুর্থ : ওরে, সর্বনাশ হয়ে গেল যে রে! কুমার ইন্দ্রকুমারকে কি কেউ খবর দিতে ছোটেনি?

তৃতীয় : অনেকক্ষণ গিয়েছে—আরাকানের ফৌজ আমাদের ফাঁকি দিয়ে আক্রমণ করতেই তখনই লোক গেছে—তাঁকে খুঁজে পেলে তো হয়।

দ্বিতীয় : কুমার রাজধর কি এখনও খবর পাননি?

চতুর্থ : তিনি কোথায় আছেন খবরই পাওয়া গেল না—বোধকরি ত্রিপুরার দিকে চলে গেছেন। যুবরাজের সংবাদ জানতে পেলে এতক্ষণে তিনিও দৌড়ে ছুটে আসতেন।

প্রথম : আমরা কোন্ মুখে দেশে ফিরব!

তৃতীয় : ফিরব কেন, মরা যাক।

চতুর্থ : যুদ্ধই ফুরিয়ে গেল তো মরব কী করে!

অপর ব্যক্তির প্রবেশ

অপর : ওরে করছিস কী! সর্বনাশ হল যে— একবার খোঁজ করবি চল।

চতুর্থ : হাঁ রে, চল—আমরা ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাই।

তৃতীয় : আমাদের ভাগ্যে তিনি কি বেঁচে আছেন?

দ্বিতীয় : আমি ভাবছি, ইন্দ্রকুমার যখন এ খবর শুনবেন তখন তিনি কি প্রাণ রাখতে পারবেন!

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্র

ইন্দ্রকুমার ও সৈনিক

ইন্দ্রকুমার : কোথায়—কোথায়—কোথায়? ওরে দাদা কোথায়?

সৈনিক : তাঁকেই তো খুঁজছি, প্রভু।

ইন্দ্রকুমার : আর, ইশা খাঁ?

সৈনিক : আজ বেলা চার প্রহরের সময় যুবরাজ স্বহস্তে ইশা খাঁর কবরে মাটি দিয়েছেন—সেই মাটিতে তাঁর নিজেরও রক্ত তখন মিশছিল।

ইন্দ্রকুমার : ধিক্ ধিক্ ধিক্, ইন্দ্রকুমার! ধিক্ তোকে! ধিক্ তোর চণ্ডাল রাগকে! দাদা! দাদা! এই নরাধমকে একবার মাপ চাইতেও সময় দেবে না? (*উচ্চৈঃস্বরে*) দাদা! সাড়া দাও। কেবল এক মুহূর্তের জন্যেও সাড়া দাও। ওরে, আর কেউ নেই নাকি? যে যেখানে আছিস সকলে মিলে তাঁকে খোঁজ—আজ আমার দাদাকে চাই-ই যে।

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

দ্বিতীয় : এই দিকে চলুন কুমার। তাঁর দেখা পেয়েছি।

ইন্দ্রকুমার : কোথায়? কোথায়?

দ্বিতীয় : কর্ণফুলির তীরে সেই অর্জুন গাছের তলায়।

ইন্দ্রকুমার : সত্য করে বল, তিনি কি—

দ্বিতীয় : তিনি বেঁচে আছেন—তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে রয়েছেন।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণফুলির তীর। তরুতলে জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে

যুবরাজ : ওরে, সরিয়ে দে রে, একটু সরিয়ে দে! গাছের ডালগুলো একটু সরিয়ে দে, আজ আকাশের চাঁদকে একটু দেখে নিই। কেউ নেই! এ কি গাছেরই ছায়া, না আমার চোখের উপরে ছায়া পড়ে আসছে! এখনও কর্ণফুলির স্রোতের শব্দ তো শুনতে পাচ্ছি! এই শব্দটিতেই

কি পৃথিবীর শেষ বিদায়সম্ভাষণ শুনব! ইন্দ্রকুমার! ভাই ইন্দ্রকুমার! এখনও তোমার রাগ গেল না!

ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার : দাদা! দাদা!

যুবরাজ : আঃ, বাঁচলুম ভাই! তুমি আসবে জেনেই এত দেরি করেই বেঁচেছিলুম। তুমি অভিমান করে গিয়েছিলে বলেই আমি যেতে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু, অনেক রাত হয়ে গেছে ভাই, এবার তবে ঘুমোই— মা কোল পেতেছেন।

ইন্দ্রকুমার : দাদা! মার্জনা করলে কি!

যুবরাজ : সমস্ত, সমস্তই! এখানকার যা-কিছু ছিল এই রক্ত দিয়ে মার্জনা করে গেলুম। কিছুই বাকি রাখিনি। কেবল একটি দুঃখ রইল, মহারাজের কাছে খবর পাঠাতে হবে আমার পরাজয় হয়েছে।

ইন্দ্রকুমার : পরাজয় তোমার হয়নি দাদা— আমারই পরাজয় হয়েছে।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক : কুমার রাজধর যুবরাজের পদধূলি নেওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ইন্দ্রকুমার : কখনো না! কিছুতেই না!

যুবরাজ : ডাকো, ডাকো, তাকে ডাকো!

ইন্দ্রকুমার : (রাগিয়া) দাদা, রাজধরকে—

যুবরাজ : আবার ভাই! আবার!

ইন্দ্রকুমার : না, না, না, আর নয়। আমার আর রাগ নেই।

রাজধরের প্রবেশ

রাজধর : আমি নরাধম। এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম। এ তোমারই।

যুবরাজ : আমার সময় নেই। ইন্দ্রকুমারকে দাও, ভাই।

রাজধর : দাদার আদেশ মাথায় করলেম। এ মুকুট তুমি নাও।

ইন্দ্রকুমার : আমি পরাজিত— এ মুকুট আমার নয়। এ আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম। —দাদা!